খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী

নিগূঢ়ানন্দ

শরৎ পাবলিশিং হাউস
৯/৪ টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী ছায়া চ্যাটার্জী

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রনালয়,
১২ বিনোদ সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশকের বক্তব্য

বর্তমান গ্রন্থ একজন নাস্তিকের আস্তিক হবার বিচিত্র কাহিনী। এই জন্য এ গ্রন্থের প্রথম ভাগ আমাদের প্রচলিত সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ দিয়ে শুরু। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত অবশ্য সনাতন হিন্দু ধর্মের নিকট আত্মসমর্পণ। সেইজন্য পাঠকের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন এ গ্রন্থের প্রাথমিক অংশ দেখে লেখকের মানসিকতাকে কালাপাহাড়ী বলে ভাববেন না।

বেদ, উপনিষৎ, ষড়দর্শন, মায় গীতা চণ্ডী পর্যন্ত আমাদের যতসব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, এই ধর্মগ্রন্থগুলির যথার্থ মূল্য যাচাই করবার প্রত্যক্ষ পথ একটিই আছে, যার নাম যোগ। সমগ্র সৃষ্টির মূল রহস্য এই দেহের মধ্যেই আছে বলে যোগীদের ধারণা। এই জন্য দেহকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পরম এক অদ্বৈত থেকে অব্যক্ত রহস্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। অদ্বৈতের গুণ বা শক্তি থেকেই এই সৃষ্টি। সেই শক্তি বস্তুজগতের মৌল উপাদান সৃষ্টি করার পর বস্তুর মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘুমিয়ে আছে। এই শক্তি কুণ্ডলিনীশক্তি নামে তন্ত্রে পরিচিত। মানুষের দেহের মধ্যে মূলাধারে এই শক্তি সূক্ষ্ম লিঙ্গকে বেষ্টন করে কুণ্ডলিনী শক্তি হিসেবে ঘুমন্ত থাকে। যোগের সাহায্যে সেই শক্তিকে জাগরিত করে দেহের অভ্যন্তরস্থ ছয়টি চক্রকে ভেদ করে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে ঠেলে দিতে পারলে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়। মানুষ সৃষ্টি-রহস্যের সমস্ত গোপন খবর জানতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক অদ্ভুত ভাবে সেই ভারতীয় যোগ সাধনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে যোগ সাধনায় তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতার কথা অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তির ঊর্ধ্বগতির ফলে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তার কথা

তিনি বর্তমান গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। গুহ্যবিদ্যা হিসেবে এ বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা এ যাবৎকাল সাধকেরা কিছুটা গোপন রেখে ব্যক্ত করতেন। সরাসরি এ অভিজ্ঞতার কথা কখনও বলতেন না। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের লেখক স্পষ্ট এবং সহজ ভাষায় কিছু গোপন না রেখে সরাসরি তা প্রকাশ করেছেন।

লেখক মূলতঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং আধুনিক শিল্প কৌশলের সঙ্গে সুপরিচিত। আধুনিক লেখক হিসেবেই মূলতঃ তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সেই আধুনিক শিল্পীসুলভ কুশলতার সঙ্গে তিনি ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের এক দুরূহ অংশকে সুললিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে বর্তমান গ্রন্থটি তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে সুললিত শিল্পের সংমিশ্রণে এক অনবদ্য উপহার হিসেবে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

এই গ্রন্থের ভ্রমণ অংশের অনেকখানিই লেখকের পূর্ববর্তী একটি ভ্রমণোপন্যাস 'রাজপথ তীর্থপথ' থেকে নেওয়া। বর্তমান গ্রন্থটি যদি সনাতন হিন্দু ধর্মের সত্যরূপ প্রকাশে বিন্দুমাত্রও সহায়ক হয় আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

—প্রকাশক

● লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কর্মব্যস্ত, পরোপকারী ও ধর্মপরায়ণ কৌঁসুলি শ্রীযুক্ত মহীতোষ চট্টোপাধ্যায় এম. এ, এম. কম, এল. এল. বি, ১৬/১ প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা-২৬

—বন্ধুবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

মহাতীর্থ একাম্র পীঠের সন্ধানে (২য় সংস্করণ)

সতীক্ষেত্র ছাব্বিশ উপপীঠের সন্ধানে

একাম্র পীঠের সাধক—১ম

একাম্র পীঠের সাধক—২য়

খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী

জীবনটা একটা বিরাট রহস্য। কেনই বা এই প্রাণের উৎপত্তি কেনই বা তার লয়—এর অর্থ কেউ কোথাও খুঁজে পেয়েছে কিনা জানি না। অতীন্দ্রিয় জগতের সৃষ্টি বোধহয় মানুষের এই বিরাট প্রশ্ন থেকেই। জীবনের ঊর্ধ্বে কোন জীবন আছে কিনা, কোন এক মহা জীবনের মধ্যে এই জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, এই জন্যই বোধহয় অধ্যাত্ম সাধনার জন্ম। কিন্তু এই অধ্যাত্ম সাধনাতে, ধর্ম সাধনাতেই কি এই সবচেয়ে বড় রহস্যের কোন জবাব পাওয়া গেছে? প্রাচীনতম মেসোপোটেমীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, কোন সভ্যতাই কি এর জবাব দিতে পেরেছে? যাঁরা ঈশ্বরের খেয়াল খুশির উপর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সকল কৃতিত্ব ছেড়ে দিয়েছেন তারা বিশ্বাস্য নন। হাত-পা-ওয়ালা কোন ঈশ্বর শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন—বিজ্ঞানে একথার স্বীকৃতি নেই, তর্কবিদ্যাতেও নেই। হাত-পা-ওয়ালা ঈশ্বর যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে সৃষ্টির মালমসল্লা তিনি পেলেন কোথায়? ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে এ ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। যদি সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব সত্য হয় তবুও তর্কবিদ্যাতে তা টেকে না। শঙ্করের মায়াবাদের যথার্থ অর্থ ধরা সহজ নয়। জগৎ মিথ্যা হতে পারে না, সত্য থেকে মিথ্যার উৎপত্তি হতে পারে না। সুতরাং জবাব কি? বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক গার্গীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি বলে ধমকে উঠে বলেছিলেন, আর এগিও না, তোমার মাথা খসে পড়বে। শেষ পর্যন্ত একটিই মাত্র জবাব হয়েছে, অবাঙ্‌মানসগোচরম্‌।

সত্য এমন একটা জিনিষ যাকে বলে প্রকাশ করা যায় না। তা যদি হয় তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যাখ্যার অতীত সেই জিনিসে

আস্থা স্থাপন করা কষ্টকর। সেই জন্যই ইউরোপে দেখা দিয়েছে Existentialism. এর যন্ত্রণা আরও বেশী। জীবনটা তখন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। জীবন তখন হয় আরও যন্ত্রণাময়, যে জীবনের কথা কামু ও কাফ্‌কার লেখনীতে ফুটে উঠেছে। সার্ত্রের মত দার্শনিকও এর কোন জবাব পাননি। অবিশ্বাসের যন্ত্রণার চাইতে বিশ্বাসের ব্যর্থতাও ভাল, তাই বোধহয় মানুষ শেষপর্যন্ত এটা কাল্পনিক ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে।

জীবনের পরমাশ্চর্য জিনিষ হল এই ভ্রান্তি যে, মানুষ মরবে একথা জেনেও মৃত্যু সম্পর্কে সে ভাবে না। সে কখনও মরবে এ কথা চিন্তা করতে পারে না। এই ভ্রান্তিই হল মায়া। আমার মনে হয়, যারা এই মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন তারা মোহমুক্তিপ্রয়াসী মানুষের চাইতে অনেক বেশী সুখী। জীবন সম্পর্কে চিন্তা করলে—হয় মানুষ উন্মাদ হবে, নয়তো স্বেচ্ছাচারী হবে। পরমার্থের যথার্থ জবাব পেয়েছে কে?

আমি কি গভীর ভাবে জীবনের এই দিকটি নিয়ে কখনও চিন্তা করেছি? না। দশজন মানুষ যে পথে চলে আমিও এ যাবৎকাল সেই পথেই চলেছি। স্বপ্ন দেখেছি, পরিকল্পনা করেছি। ব্যর্থ হয়েছি, আবার নতুন পরিকল্পনায় মন দিয়েছি। সমগ্র জীবজগৎ আশার হাতছানীতে ছুটে চলেছে, আমিও চলেছি। তবে অকস্মাৎ এই প্রশ্ন কেন? জীবন-সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ছে, তাই কি আমার এই প্রশ্ন? বৃদ্ধ বয়সে নাকি জীবন শেষ হয়ে আসছে এই বোধ থেকে ধর্ম কর্মে মন আসে। কিন্তু এ ধরনের তত্ত্বে আর যে-ই বিশ্বাস করুক, আমি করি না। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য যতই হেলে পড়ে, ততই মানুষ পৃথিবীর প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করে। সত্য সম্পর্কে চিন্তা করার চাইতে মিথ্যার মায়াই তাকে বেশি জড়ায়। অবসর প্রাপ্ত বহু শিক্ষিত লোককে পার্কে বা লেকের ধারে বেঞ্চে বসে রাজনীতি, সিনেমা, আধুনিক ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি। স্মৃতিচারণাই বেশি, ঈশ্বর-চারণা কম। এবং জগতের আরও একটা আশ্চর্য জিনিষ এই বৃদ্ধদের

মধ্যেই দেখা যায়। অতীতের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তাঁরা আধুনিক জীবনের সমালোচনা করেন। গভীর ভাবে নিজেদের অতীতের দিকে তাকালে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, ভবিষ্যৎ অতীতের বুকে দাঁড়িয়েই অগ্রসর হয়।

কিন্তু সে সব থাক। আমার নিজের প্রশ্নে আসা যাক। আমি কি যথার্থই জীবন-রহস্যের চাবিকাঠি হাতে পাবার জন্য আপন অন্তরের তাগিদে এ পথ নিয়েছি? অন্তরতমের কথা জানি না, কেউই বোধহয় জানেন না। তাইতো বৈজ্ঞানিক Pascal বলে উঠেছিলেন—'The heart has its reason of which reason knows nothing.' আমার গভীবতম অন্তর-প্রদেশের ইতিহাস আমি জানি না। তবে চেতন মনের খবর যতটুকু রাখি, তাতে ধারণা যে, এ পথের পথিক হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার ছিল না। তবে? কেউ কেউ বলবেন, প্রাক্তন আছেন আমার অন্তরতম হৃদযের প্রদেশে। সেই প্রাক্তনের নির্দেশেই আমার এই নয়া অভিযান। প্রাক্তন মানে পূর্ব জীবন। সত্যিই সেটা আছে কিনা কে বলবে। লাহিড়ী বাবা আমায় বলেছিলেন, একদিন আসবেন, আপনার প্রাক্তন জীবন আপনাকে দেখিয়ে দেব। লাহিড়ী বাবা যে-সে ব্যক্তি নন, মহাযোগী পুরুষ। মহাযোগী পুরুষ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর তিনি উত্তর পুরুষ। নাতি। তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এখনও আমি আমার প্রাক্তন জীবনের ছায়াছবি দেখতে যাই নি। কিন্তু সে প্রসঙ্গে কথা হবে পরে, এখন আমার নিজের কথা বলি। ধর্মপথে কলম ধরার পেছনে যে একটা দুর্ঘটনা আছে সে কথাই ব্যক্ত করি।

আমার এক স্নেহধন্য তরুণ প্রকাশকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল একদিন। বই ছাপিয়ে ভাগ্য তার আর ফিরছে না। আমায় বলল, কি করি? আমি বললাম চিৎপুরের ব্যবসা কর, অর্থাৎ চিৎপুরের প্রকাশকেরা যেমন সস্তায় চমকপ্রদ বই ছাপিয়ে বিক্রী করে এককালে বড়লোক হত, তাই কর।

ও বলল, কি ধরনের বই?

বললাম, ধর্মের বই কর। অর্থনৈতিক ডিপ্রেশনের যুগে ধর্মের বই ভাল চলে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে। দুঃখ-দুর্দশায় ইউরোপের লোকেরা যেখানে বিদ্রোহ করে, ফরাসী বিপ্লব হয়, রুশ বিপ্লব হয়, ভারতের লোকেরা সেখানে আরও বেশী করে অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়। চোর বদমাসদের তখন আরও পোয়া বারো। ভারতবর্ষের এখন প্রচণ্ড দুর্দশার দিন। সাধারণ মানুষের কাছে জীবনের পথ এখন সব দিক থেকেই বন্ধ। তারা না পারবে চুরি করতে, না পারবে কাজ করতে। এদেশে এক পয়সার বেশি চুরি করার হিম্মৎ যাদের নেই, তারা ধরা পড়ে, চোর হয়। কোটি টাকা চুরি করার যাদের হিম্মৎ আছে তাঁরা মহাজন ব্যক্তি। তাঁরা কেউ বা দেশ চালান, সমাজ সেবক হন, কেউ বা হন বিজিনেস ম্যাগনেট। সাধারণ মানুষের দেহ আছে শ্রম দিতে চান, শ্রমের সুযোগ নেই। বুদ্ধি আছে ব্যবসা করতে চান, ক্যাপিটাল নেই। তাদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তাঁরা ঘটে-ঘটে, থানে-থানে, মন্দিরে-মন্দিরে পূজো দেন। তারও চেয়ে একটু যাঁরা উপরের, তারা ধর্মের বই কিনে পড়েন। যাঁদের বুদ্ধি তারও উপরে তাঁরা সৎগুরুর চেলা হন। যাঁরা তারও উপরে তাঁরা সন্ন্যাসীর ভেক নেন। কারণ, এদেশে সৎ অসহায় মানুষকে যে লোক সাহায্য করে বাঁচতে দেবে না, সেই লোকই পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় সাধুসন্তকে ভিক্ষে দেবে। এদের মধ্যে আবার যাঁরা আরও বেশি চালাক তাঁরা অলৌলিক ক্ষমতা ভর করেছে বলে 'ভরে' বসবেন। আরও একটু উপরের স্তরের বুদ্ধিমানেরা জ্যোতিষী সাজবেন। যাঁরা কোন পথেই যেতে পারেন না তাঁরা তিন রাস্তার মোড়ে শনিঠাকুর বসিয়ে পূজো দেবেন। যাঁদের মাথা মোটা, যাঁরা মস্তান, তাঁরা বারোয়ারী পূজো করে চাঁদা তুলবেন। এদেশে আর কিছু চলুক না চলুক ধর্ম চলবে, এবং চলেও। ধর্মের বই লেখে যে বড় বেশি গুলগপ্প মারবে তার বই তত বেশি চলবে। সুতরাং—

সুতরাং তরুণ প্রকাশকটি জিজ্ঞেস করল, কি ধরনের ধর্মের বই ছাপব বলুন তো? ভারতের সাধক বেরিয়ে গেছে, তার পথ ধরে বা লাব সাধক? কোন্ ধর্মের বই লিখলে বেশি চলবে?

কি দুর্মতি চাপল মাথায়, বললাম, একান্নটি মহাশাক্তপীঠ আছে ভারতবর্ষে। তার উপর বই লেখ্, চলবে।

ও বলল, মন্দ নয়। আপনিই তাহলে লিখে দিন।

আমি বললাম, মাথা খারাপ! জীবনে ধর্ম করিনি, ইচ্ছেও নেই। তাছাড়া একান্নটি শাক্তপীঠের নামই জানিনা তো। লিখব কি?

—তাহলে?

বললাম চিৎপুরের যারা বই লেখে তাদের ধর। তারা পারবে। কোক শাস্ত্র থেকে ভক্তি শাস্ত্র, জ্যোতিষ থেকে বিজ্ঞান, তারা না জানে হেন বিষয় নেই। তাদের কাউকে ধর।

ও বলল, ওদের কাউকে জানা নেই। কাজটা আপনিই করে দিন।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমার তখন রীতিমত বিবাদ চলেছে। বাজারে আমার বই বেরিয়েছে 'ঈশ্বর মরে গেল' 'দণ্ডিত আসামী' ইত্যাদি। বললাম, লেখক না হতে পারি তভ্‌ভি আচ্ছা, কিন্তু ঈশ্বরের প্রচারক হবার মত মানসিকতা আমার নেই। সুতরাং প্রচারক হবার লোক যাদের পাবি, তাদের ধর।

রাজি হলাম না ধর্মের উপর কোন বই লিখতে। কিন্তু যে ভাগ্যকে আমি মানি না, সেই ভাগ্যই বোধহয় তখন আমার হাসছিল। কারণ তা না হলে এমন ঘটনা ঘট্‌তো না।

কথায় কথায় একদিন আমার এই প্রস্তাব তরুণ প্রকাশকটি রেখেছিল আমার বর্তমান প্রকাশক দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কী সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তিনি এ প্রস্তাবের মধ্যে তিনিই জানেন! শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আমি যখন তরুণ প্রকাশকটির ঘরে বসে আছি দেখি দুলালবাবু এসে হাজির। হাতে এ্যাডভান্সের টাকা, বললেন, বইটি আমায় লিখে দিন।

আমি বললাম, সে কি ! এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই।

তিনি বললেন, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে, মানুষ সব পারে।

আমি বললাম, নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বলেছিলেন যে, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু তিনি কি সব কিছু পেরেছিলেন ? আমাকে দ্বারা একাজ হবে না।

দুলাল বাবু আমার কথা শুনলেন না, হাতে টাকা গুঁজে দিলেন।

বললাম, যদি না পারি ?

তিনি বললেন, টাকা ধীরে ধীরে ফেরৎ দেবেন।

টাকা নিতে হল, এবং সেই থেকে আমার দুর্ভাগ্যের শুরু। ভাগ্য আমি মানি না বটে, তবে এমন একটা শক্তি সকলের অগোচরে কাজ করে যে, আমাদের সব কিছুই বুঝি অদ্ভুত ভাবে তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। নইলে আমি একজন রোমান্টিক কল্পনার অধিকারী, আমার নাম কেন এমন হবে ? ছোটবেলা নাকি ঝুম্ মেরে বসে থাকতাম একা একা। সেই জন্য পিসিমা নাম রেখেছিলেন নিগূঢ়ানন্দ। স্কুলে ভর্তি হবার সময় এ নাম বলতে হেডমাষ্টার বললেন, এ নামটা ভাল নয়, তোর ভাল নাম কি জেনে আয়। বাড়ি ফিরে দেখি পিসিমা পড়ছেন শ্রীমদ্ভাগবত। পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পিসিমা আমার ভাল নাম কি ? তিনি তখন বোধহয় পড়ছিলেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-স্বরূপের কথা। না ভেবে, না চিন্তে বলে দিলেন, যা, বলগে সচ্চিদানন্দ। দুটো নামের সঙ্গেই জুড়ে গেল স্বামিজী স্বামিজী গন্ধ, ধর্ম ধর্ম ভাব। ভাগ্যের প্রহসন আর কাকে বলব ! আমার প্রথম প্রকাশক আমার ডাক নামে বই ছাপালেন। সেই থেকে আমি 'নিগূঢ়ানন্দ' হয়ে আছি।

দুলালবাবু আমায় কাজ দিলেন বটে, কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগার ঘেঁটে ঘেঁটেও বইয়ের মাল মসল্লা আর জোটে না ! নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষে একান্নটি পীঠের নাম পাওয়া গেল বটে কিন্তু স্থানগুলির কোন হদিশ নেই। এজন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের কোন প্রয়োজন ছিল না। যে-কোন সাধারণ পাঁজিতেই কাজ হত। ধর্মের বইয়ে কাজ হল না। বরং

কছুটা সাহায্য করল ইতিহাস। দর্শনগ্রন্থ পড়েছিলাম কিছুদিন আগে, স্মৃতিচারণায় একান্নপীঠের অধ্যাত্ম পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করতে কাজে লাগল। কিন্তু স্থানের হদিশ তখনও দূর অস্ত্। ঐতিহাসিক দীনেশ চন্দ্র সরকারের 'শাক্তপীঠ' বইটি স্থান নির্ণয়ে কিছুটা সাহায্য করল বটে, সবটা নয়। অযাচিত সাহায্য করলেন কিছু সংখ্যক তান্ত্রিক। শেষ পর্যন্ত বইটি বেরুল।

আমার এক বন্ধু। তাঁর আত্মবিশ্বাস যেমন নিবিড়, অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাসও তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। একদিন আমায় বললেন, চলুন, এক ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া যাক।

জিজ্ঞাসা করলাম, কে ?

তিনি বললেন, এক জ্যোতিষী।

—কোথায় থাকেন ?

—এই কাছেই।

—নাম কি ?

—নামের দরকার নেই। লোকে ডাকে বাবাজী বলে।

—চলুন।

আমি জানি, আমার হাতে শুধু দুর্ভাগ্যের কথাই, লেখা আছে। তবুও সৌভাগ্যের একটু ক্ষীণ দৃষ্টি পাবার জন্য মাঝে মাঝেই কৌতূহল জাগে। সুতরাং লোভে লোভে সাড়া দিলাম।

জ্যোতিষী আমি আগে অনেক দেখেছি বটে, এমন জ্যোতিষী দেখিনি। তিনি আমার হাত দেখে এমন কয়টি কথা বললেন, যে-কথা হাতে লেখা আছে বলে আমার কিছুতেই বিশ্বাস নয়। তবে কিছুটা বিশ্বাস হয়েছে আংশিক ফল লাভে। ভবিষ্যতের যে অশুভ ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন সেটি ফলেছে। তবে তিনি যে আমার সুখ সম্পদের কথা বলেছিলেন, তা ধারে কাছে আসেনি, আরও দূরে সরে গেছে। কিন্তু আমার লেখার লাইনের ধারাটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনিই। বাবাজী আমার হাত দেখেই আমার বন্ধুটিকে বলেছিলেন, যে-লোককে

নিয়ে এসেছেন, একদিন চেষ্টা করলেও তার দেখা পাবেন না।' এরপর থেকে যত জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছি, তারা প্রায় সবাই আমাকে একই কথা বলেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত আমি এই কথাই বুঝেছি যে, এদের সবার আগেই আমার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে এবং চর্মচক্ষুতে এরা কেউই আর আমার দেখা পাবেন না।

বাবাজী দ্বিতীয় যে কথা বলেছিলেন, তা হল এই যে, রোমান্টিক লেখায় আমার ভাগ্য ফিরবে না। আমার original line তন্ত্র। বলেছিলাম, তন্ত্র সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই, তবু যে আপনি একথা বলছেন?

তিনি হেসে বলেছিলেন, এ আপনার প্রাক্তন।

'প্রাক্তন' জিনিষটি এক রহস্যময় ব্যাপার আমার কাছে। এখনও এ সম্পর্কে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই বলেছিলাম, প্রাক্তন বলতে আপনি কি বোঝেন?

তিনি বলেছিলেন, আপনার পূর্ব জন্মের কর্মের ফল।

—পূর্ব জন্মেব কর্মের ফল এ জন্মে কাজ করে?

—করে।

—কি রকম?

বাবাজী আমাকে ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়েছিলেনঃ কেউ দেখবেন, না শেখাতেই ভাল গান গায়, ছবি আঁকে, লেখে। এসব কেন হয়? তার ভেতরে যদি এসব অভিজ্ঞতা না থাকত, তাহলে এমন হত? আমি বলেছিলাম, উত্তরাধিকার সূত্রে হয়। পরিবেশের প্রভাবেও হয়। বাবাজী হেসে বলেছিলেন, তা যদি হত, তাহলে রবীন্দ্রনাথের ছেলে রবীন্দ্রনাথ হত, বিদ্যাসাগরের ছেলে অন্ততঃ বিদ্যের পুকুর হত। তাছাড়া একই পরিবেশে থেকেও দশটি ছেলে দশরকম হয়। পরিবেশের প্রভাব বড় হলে সবাই এক রকম হত, তা হয় কি?

বলেছিলাম, ও ভাবে বিচার করে দেখলে তা হয় হয়না বটে, কিন্তু

তাই বলে পূর্বজন্ম আছে বলে বিশ্বাস করি কি ভাবে? থাকলে মনে পড়ে না কেন?

বাবাজী বলেছিলেন, এ জন্মেই ছোটবেলার অনেক কাহিনী অনেকের মনে থাকে না। তাই বলে ছোটবেলা কি ছিলনা?

—তা বটে। তবে—

—'তবে' কিন্তু নেই। স্মৃতিকে প্রখর করতে পারলেই সব ধরা পড়ে।

—স্মৃতিকে প্রখর করা যায় কিভাবে?

—ধ্যানে। একাগ্র মনঃসংযোগে। একাগ্র মনঃসংযোগ করে কেউ যদি নিজের অতীতের দিকে তাকায়, তাহলে অনেক কিছুই দেখতে পাবে। মনসংযোগ গভীর হলে পূর্বজন্মও দেখা সম্ভব।

জানিনা। এসব নিয়ে তখন আমি আর কোন তর্কও করিনি। সবটা যে বিশ্বাস করেছি, তাও নয়। তবে বাবাজীর একটি কথা আমার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তন্ত্র সম্পর্কে আমার কোন অনুরাগ না থাকলেও তন্ত্রই আমাকে এ সম্পর্কে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। আমার প্রাক্তনের চাপেই এমন হয়েছিল, না আমার গোপন মনের নামের আকাঙ্ক্ষাই আমাকে এপথে টেনেছিল, বলা কঠিন। তবে চেতন মনের আলোতে যা আমি দেখি, বিচার করতে পারি, তাতে আমার মনে হয় যে, নামের আকাঙ্ক্ষাই আমাকে এ পথে টেনেছিল বেশি। সমাজ-সাহিত্যের পথে লিখে যখন কিছু হবার নয়, তখন ধর্মের পথে চললে যদি কিছু হয়, তাতে ক্ষতি কি? সুতরাং আমার নতুন পথের এই শুরু। 'মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে' তন্ত্রের বই নয়, একটা ইতিহাস গ্রন্থ। সেই ইতিহাস গ্রন্থই আমার জীবনে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে এখন। ইতিহাস থেকে যথার্থই তন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছি।

তন্ত্রের পথে পদক্ষেপ ঘটেছে আমার আর একটি ঘটনায়, একটি চিঠিতে। চিঠিটি বিদেশ থেকে আগত। লেখক একজন বিখ্যাত

Indologist, টাইটাস বেনজামিন। বাংলা জানেন, বাংলা লিখতে পারেন। তাঁর মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে যখন বিদেশ থেকে 'মহাতীর্থ একাম্ন পীঠের সন্ধানে'র স্বীকৃতি পেলাম তখন তন্ত্রপথে আমার আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল। এই বিদেশ থেকে স্বীকৃতির কথা, বিদেশ যাবার কথা 'বেনুদা' আমায় আগেই বলেছিলেন, যাঁর কথা পরে বলব। সুতরাং আস্থার পরিমাণ তাঁর উপর কিছুটা বেড়েছিল আমার।

শূন্য থেকে একবার 'এক' থেকে 'নয়' পর্যন্ত সংখ্যা বের করে আনতে পারলে বোধহয় বাকি অসংখ্য সংখ্যা আপনিই এসে যায়। বিশ্ব-রহস্যের এই গোপন কাঠি বোধহয় রয়েছে এই এক থেকে নয়ের মধ্যে। একটি তন্ত্র গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ যেন আমার সেই নবগ্রহ, নয় সংখ্যা। এর পর যোগে সংযোগে সে সংখ্যা বেড়েই চলেছে। চাই, না চাই, এগিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে তন্ত্রের পথেই।

'মহাতীর্থ একাম্ন পীঠের সন্ধানে' বইটি সুপার হিট নয় তবে চলেছে। প্রকাশক খুশি। বললেন, আরও লিখুন। এ পথেই চলুন। সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীর মত অন্ততঃ আমাদের দেশে লেখকেরও জীবন। যে অভিনেতা একবার কাঁদিয়েছেন তাকে চিরকাল ট্র্যাজেডির ভূমিকাই নিতে হয়। যিনি হাসিয়েছেন, চিরকালই তাঁকে হাসাতে হয়। ধর্মে যখন সামান্য স্বীকৃতি, ধর্মেই তখন আমার মৃত্যু, এ কথা জেনেছি আমাদের দেশে পাঠকের রুচিধর্ম দেখে। বাবাজী জ্যোতিষীর কথাই হয়তো সত্য হবে।

আমার প্রকাশক দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায় একদিন আমায় বললেন, একাম্নটি পীঠের কথা বলেছেন, ছাব্বিশটি যে উপপীঠ আছে, তার কথা লিখুন! ফলে বেরুল 'সতীক্ষেত্র ছাব্বিশ উপপীঠের সন্ধানে।' কিন্তু এর কোনটাই তন্ত্রগ্রন্থ নয়, ইতিহাস মাত্র। কিছু তান্ত্রিক সাধকের উপর লিখব কিনা—ভাবতে লাগলাম। ভাগ্য যদি তন্ত্রের উপর নির্ভর করে তবে............হাত দিলাম 'একাম্নপীঠের সাধকে'।

ভারতের সাধকের কাহিনী লেখা যায়, কারণ এঁদের অনেকেই

লোকালয়ে গুরুগিরি করেছেন, শিষ্য সামন্ত রেখে গেছেন। শিষ্য সামন্তদের কাছে সাধারণ ঠকবাজ গুরুও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাশালী হয়ে দেখা দিয়েছেন। যা নয়, তাই হয়ে তাঁর জীবনী বেরিয়েছে। এ জীবনী লভ্য। ভারতের সাধকের কথা লেখা সম্ভব, কিন্তু শাক্তপীঠের শ্মশান-চারিণী মায়ের শ্মশানবাসী ছেলেদের হিসেব পাওয়া যাবে কোথায়? সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে এঁরাও যে শ্মশানবাসী। সংসার জীবনের পরিচয় এঁদের নেই। এঁদের জীবনী লেখা দুষ্কর। তবুও আমি যাতে বিশ্বাস করি না দুলালবাবু তাতে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই, এই বিশ্বাসে ভর করে এগিয়ে যেতে বললেন তিনি। 'একান্নপীঠের সাধক' লিখতে খুঁজে পেতে আমাকে শেষপর্যন্ত যেতে হল ভারতের সাধকের কাছেই, যে বইটিকে আমি সবচাইতে অপছন্দ করি। ভারত সংস্কৃতির অপমৃত্যুর একটি তোরণ এই ভারতের সাধক, এই আমার ধারণা। এতে অবিশ্বাস্য অলৌকিকতা আছে। কিন্তু অলৌকিকতার অন্তরালে যে তত্ত্ব কাজ করে তার কোন হদিশ নেই। এ ধরনের অবিশ্বাস্য গল্প-কাহিনী মানুষকে সাধু-সন্তের পোঁ ধরতে শেখায়, ভাগ্যবাদী করে তোলে, ভণ্ড সাধুর কাছে ভিড় জমাতে সাহায্য করে, মানুষকে কর্মবিমুখ করে তোলে। এ ধরনের বই কল্যাণকর তো নয়ই বরং ক্ষতিকর। সুতরাং আমার কাহিনী লেখার সময় আমি তত্ত্বের খোঁজই বেশি করলাম, তথ্যের তত নয়। কিন্তু আমাদের নানা সাধক কাহিনীর মধ্যে একান্ন পীঠের সাধকের হদিশ কই! সুতরাং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে ক্ষীণ কলেবর বই প্রকাশ করে। ফলে হাতড়ে বেড়াচ্ছি সাধুসন্ত। ক্ষ্যাপার 'পরশ পাথর' খোঁজার মত একটা নেশা চলেছে বোধ হয়। খুঁজে বেড়াচ্ছিতো বেড়াচ্ছিই। হয়তো হাত গলে আসল রত্ন বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি খুঁজছিই। সাধক খুঁজতে খুঁজতে আমি সাধু হইনি নিশ্চয়ই। কিন্তু মদের নেশার মত এও এক নেশা, আমি ছাড়তে চাইলেও নেশা এখন আমাকে ছাড়ছে না। যেন সাধু সন্তরাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমাকে, এমন ভাব। লাহিড়ী বাবার

কথা মনে পড়ছে। আমায় দেখেই তিনি বলেছিলেন, অনেক মহাপুরুষ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার উপর দৃষ্টি রেখেছে। সময়মত তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

মহাপুরুষ সম্পর্কে আমার ধারণা কখনই খুব মধুব নয়। মহাপুরুষকে আমি ইংরেজীতে বলি Great man. মহাপুরুষ সম্পর্কে আমার ধারণার কথা আমি আমার 'ঈশ্বর মরে গেল' উপন্যাসের প্রথমেই বলেছি যে, All great men are corrupted. মহাপুরুষরাই দুর্নীতি-পরায়ণ। দুর্নীতির সাহাযোই তাঁদের আত্মপ্রকাশ। গৌতম বুদ্ধ বা মহাবীর আত্মপ্রচারের কলাকৌশল জানতেন, রাজরাজড়াদের সাহায্য কি করে নিতে হয় জ্ঞাত ছিলেন। তাই গুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সেকালে যথার্থ যোগীপুরুষের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁদের নাম কেউ জানেন না। যিশুখ্রীষ্ট সুচতুর ছিলেন, কি করে জনসাধারণ্যে নিজেকে জাহির করতে হয় জানতেন। এরকম আরও অনেকেই আছেন। রামকৃষ্ণ-দেবের মত ধর্মপুরুষও বুঝতে পেরেছিলেন বিবেকানন্দের মর্ম। সুচতুর চোখে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই লোকটাই প্রচার করতে পারবে তাঁকে। তাই যত কিছু তোয়াজ করার তাকেই করেছিলেন। গিরিশ ঘোষের মত অপদার্থ লোককে করুণা দেখাবারও মূল কারণ এই প্রচার। সুচতুর লেখক যেমন কাগজের সম্পাদককে তেলিয়ে কাজ হাসিল করতে পারেন, মহাপুরুষেরাও তেমনি। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে গেলে মহাপুরুষদের পেছনের ইতিহাস তেমন সুখকর নয়—তা সে রাজনীতির ক্ষেত্রেই হোক, সমাজনীতির ক্ষেত্রেই হোক, ধর্মের ক্ষেত্রেই হোক আর শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক। একলব্য অর্জুনের চেয়ে বড় বীর হতে পারতেন। কিন্তু অর্জুনের মত বুদ্ধি ছিল না বলেই তিনি রইলেন আড়ালে, অর্জুন এলেন মহাবীর হয়ে। একলব্যের মত বহু ধর্মবীর, কর্মবীর, শিল্পী সাহিত্যিক আড়ালে মরে গেছেন। কলাকৌশল জানতেন বলেই মহাপুরুষেরা দৃশ্যপটে হাজির আছেন। নইলে কালিদাসের চেয়ে, সেক্সপীয়রের চেয়ে বড় কেউ ছিলেন না,

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি বা মিকেল এঞ্জেলোর চেয়ে বড় শিল্পী কেউ হননি —একথায় আর যে-ই বিশ্বাস করুক আমি করি না। মহাপুরুষেরা সবাই অর্জুন, একলব্য কেউ নন। তবে আমার পরিতৃপ্তি এই যে, সাধক খুঁজতে গিয়ে যে সব ব্যক্তির সঙ্গলাভ আমি করেছি তাঁরা দরকারি কলা কৌশল কেউ জানেন না বলেই বনফুলের মত রয়েছেন লোকচক্ষুর অগোচরে। আমি যাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি, সেইসব কাহিনীর নায়কদের নাম নেই। নামের জন্য আকাঙ্ক্ষাও নেই। তাঁরা আমায় যা দিয়েছেন, তার নাম অলৌকিকতা নয়, বিজ্ঞান। তাঁরা সমস্যা দিয়েছেন, সমাধান দেননি। সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র, বলে দেননি। ছাত্রকে শিক্ষক যেমন অঙ্কের বীজ দেন, সেই বীজ পেয়েছি মাত্র। অঙ্ক আমাকে নিজেকেই কষতে হবে। পাটীগণিতের সমস্যা আমায় নিজেকেই সমাধান করতে হবে। আমি এখন খুঁজে মরছি।

দুই

পথ যত বন্ধুর নদীর কলতান তত বেশী, স্রোতও বেশী। ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেই বোধহয় সত্যের প্রতি আকর্ষণ আরো বেশী জন্মে। কথা হচ্ছিল একজন সৎ ব্রাহ্মণের সঙ্গে। তবে মনে হল তিনি সৎ নন অসৎ ব্রাহ্মণ। চিরাচরিত পথে চলেন, চিরাচরিত সত্যে বিশ্বাস করেন। বিচার করেন না। জাত্যাভিমান অত্যন্ত বেশী। অপরের হাতে অন্ন গ্রহণ করেন না। অপরের স্পর্শিত জল পান করেন না। তিনি এসেছেন একটি পুজোকে কেন্দ্র করে এক গৃহস্থের বাড়িতে। গৃহস্থটি পুজো-আর্চাতে দারুণ বিশ্বাসী। কিন্তু পুজো-আর্চায় আমার বিশ্বাস সবচাইতে কম। বাংলাদেশে পুজোর প্রচলন সবচাইতে বেশী, বাঙালীর দুরবস্থাও সবচাইতে বেশী। বাঙালীর ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো, বাঙালীর ঘরে ঘরে দারিদ্র্য।

ব্রাহ্মণটির জাত্যাভিমান অত্যন্ত প্রবল। তাঁর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, অপরের ছোঁয়া যাতে না লাগে সেজন্য গৃহস্থের সন্ত্রস্ত ভাবের অন্ত নেই। ব্যাপার দেখে উঠে দাঁড়ালাম। গৃহস্থ বললেন, সেকি! প্রসাদ না নিয়েই চললেন? আমি বললাম, যে পূজো ব্রাহ্মণে করে সে পূজোর প্রসাদ নিতে অপমানবোধ করি। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের ছোঁয়া খেতেও আমার ঘৃণা আছে। আমার কাছে ব্রাহ্মণেরা অচ্ছুৎ।

গৃহস্থ তাজ্জব। হেন কথা তিনি কখনও শোনেন নি।

সং ব্রাহ্মণটি যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, এ সব আধুনিক শিক্ষা। এ জন্যেই দেশ জাহান্নামে যেতে বসেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাচীন শিক্ষাটা কি ভাল?

—নিশ্চয়ই।

—মানুষে মানুষে ভেদ?

—নিশ্চয়ই, স্বয়ং ভগবান তা তৈরি করেছেন।

বললাম, ভগবান! সে লোকটা কে?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি বললেন, তুমি অবাচীন, ভগবান লোক হতে যাবেন কেন?

—তিনি তবে কে?

—তিনি কে জান না?

—না।

—যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন তিনিই ভগবান।

—ভগবান দেখতে কি রকম?

ব্রাহ্মণটি যেন থমকে গেলেন। ভগবানকে কেউ দেখেছে যে বলবে?

—দেখেন নি, তবে বিশ্বাস করেন কেন?

ব্রাহ্মণটি বললেন, তুমি তোমার ঠাকুরদাকে দেখেছ?

—না।

—তাঁকে বিশ্বাস কর?

—হ্যাঁ।

—কেন ? না দেখে বিশ্বাস কর কেন ?

—আমার বাবার কাছে তাঁর কথা শুনেছি বলে।

—আমিও বিশ্বাস করি ভগবানের কথা আমার গুরুদেবের কাছে শুনেছি বলে।

—আপনার গুরুদেব নিশ্চয়ই ভগবানকে দেখেছিলেন ?

—নিশ্চয়ই দেখেছিলেন।

—তিনি কি রকম দেখতে, বলেন নি ? আমার বাবা তো আমার ঠাকুরদা কি রকম দেখতে ছিলেন আমাকে বলেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ-দর্শী, সুতরাং তাঁর কথায় বিশ্বাস করি। আপনার গুরুদেবের প্রত্যক্ষ দর্শন কি ?

ব্রাহ্মণটি কথা হারিয়ে রাগে থম্‌থম্‌ করতে লাগলেন।

আমি বললাম, আপনি ভগবান দেখেন নি, কিন্তু আমি দেখেছি।

—দেখেছ ?

—হ্যাঁ।

—তবে তুমিই বল, তিনি দেখতে কি রকম ছিলেন ?

বললাম, তিনি দেখতে আপনার মত ছিলেন, কারণ আপনিই ভগবান

—বিদ্রূপ করছ ?

—বিদ্রূপ করব কেন, আপনি যথার্থ অর্থেই ভগবান। কারণ—

— কারণ ?

—কারণ আপনি ভগের অধিকর্তা, আর ভগের অধিকর্তাকেই ভগবান বলে। 'ভগ' মানে জানেন না ?

দেখলাম ব্রাহ্মণ সমেত উপস্থিত অনেকেই ভগের অর্থ জানেন না তাঁরা আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, ভগ অর্থ যোনি। আপনি নিশ্চয়ই বিবাহ করেছেন, সুতরাং আপনি ভগের অধিকর্তা এবং ভগবান, এবং এভাবে আমরা অনেকেই ভগবান, একথা জানবেন।

আর একজন উপবীতধারী তরুণ গোছের তথাকথিত শিক্ষিত-ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। বললেন, এভাবে বয়স্ক ভদ্রলোককে অপমান করা আপনার উচিত নয়।

বললাম, উনি যদি অন্য সব মানুষকে অপমান করার স্পর্ধা রাখেন, তাহলে ওঁকে অপমান করতে বাধা কোথায়?

—উনি কী অপমান করেছেন?

—উনি অপর মানুষকে ছোট ভাবেন, নিচু ভাবেন, এটাই অপমান।

—আমাদের সমাজের এই বিধান।

—এই সমাজ বিধান কে করেছেন?

—এই সমাজ বিধান বেদ করেছে।

—কে বলেছে?

—বেদে লেখা আছে।

—বেদ প্রথম লিখিত হয়নি। পরে সংকলিত হয়েছে। সমাজে মানুষে-মানুষে ভেদ পরে ঢুকেছে। ইতিহাস তাই বলে, আর্য-সমাজে আগে ছিল ক্ষত্রীয় পরে ব্রাহ্মণ, তার পরে বৈশ্য। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রীয় রাজার জয়গান করাতে, তাঁর মধ্যে দেবত্ব আরোপ করে তাঁর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাতে ক্ষত্রীয়রা ব্রাহ্মণদের সমাজের পুরোভাগে নিয়ে আসে। ব্রাহ্মণদের সমাজের পুরোভাগে নিয়ে এসে তাদের নিজেদের দৈব ক্ষমতার মাধ্যম বলে চালায়, তাদের কাছ থেকে নিজেদের দেবত্বের ব্যাখ্যা আদায় করে শ্রেণী স্বার্থ আরও বেশী করে সিদ্ধ করে। ঠিক একইভাবে ইউরোপের বর্বর সমাজপতিরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, কারণ এই ধর্মের পুরোহিতেরা রাজন্যবর্গকে ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। সুতরাং মানুষে-মানুষে ভেদ মানুষেরই সৃষ্টি মানুষেরই স্বার্থরক্ষার জন্য।

একজন বললেন, এ আপনার মার্কসীয় ব্যাখ্যা, এর Validity কোথায়?

আমি বললাম, আপনাদের ব্যাখ্যা হল স্বার্থপর মানুষের ব্যাখ্যা, এরই বা Validity কোথায়?

—বেদ মানুষের সৃষ্টি নয়, বেদ অপৌরুষেয়, বেদ ভগবানের মুখ নিসৃত।

—যে ভগবানকে জানেন না, তাঁর মুখনিসৃত বাণীর মূল্য কি?

—তা হলে বেদ যে অপৌরুষেয় একথা আপনি মানেন না?

বললাম, মানব না কেন? বেদ যে মহান শিল্পকর্ম, তাই অপৌরুষেয়। যে কোন মহান কাব্যই অপৌরুষেয়। কবিতার উৎসের কথা স্বয়ং কবিও বলতে পারেন না।

—বেদকে আপনি শুধু কাব্য বলেই ভাবেন?

—বেদকে নয়, বেদের সংহিতা পর্যায়কে, অর্থাৎ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদকে। এর মধ্যে খাঁটি বেদ ঋগ্বেদ, আর মূল্যবান বেদ অথর্ববেদ। সামবেদ আর যজুর্বেদ ঋগ্বেদ থেকেই আহৃত। আর্যরা এসময় পশুচারকের পর্যায়ে ছিলেন। সবেমাত্র কৃষিকর্ম আরম্ভ করেছিলেন।

একজন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললেন, আপনার কাছে নতুন ব্যাখ্যা শুনলাম।

আমি বললাম, ইতিহাস পড়েননি, তাই। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পড়লে প্রত্যেক ঘটনারই একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য খুঁজে পাবেন।

—কিন্তু আমাদের ধর্ম সমাজভিত্তিক নয়।

আমি বললাম, আমাদের চিরাচরিত ধর্ম তাই।

উত্তেজিত বক্তাটি বললেন, জগতের সব ধর্মের মধ্যে এই সমাজ ও অর্থনীতির উৎস খুঁজে পেলেও আমাদের হিন্দুধর্মে তা পাবেন না।

আমি বললাম, হিন্দুধর্ম বলে কোন ধর্মই নেই।

—হিন্দুধর্ম বলে কোন ধর্ম নেই!

—না।

—তবে আমাদের ধর্ম কি?

—আমাদের ধর্ম 'সত্য ধর্ম।'

—অথচ ভারত সরকার পর্যন্ত আমাদের দেশের বৃহত্তম সংখ্যক মানুষকে হিন্দুধর্মের অনুসরণকারী বলে মনে করেন।

আমি বললাম, অশোকচক্রে ভারত সরকার যেরকম ধর্মের ধ্বজা তুলেছেন সেইরকম আর কি?

—অর্থাৎ।

—অশোকচক্র অর্থাৎ ধর্মের গতির উপর রয়েছে সিংহ, পশু, অর্থাৎ আমাদের সমাজকে পরিচালিত করছে পশুশক্তি। সেটা যে করছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের সবাই আমরা তা অনুভব করছি।

—অশোকচক্র তাহলে ভুল বলতে চান?

—নিশ্চয়ই ভুল নয়। কিন্তু অশোকচক্রে পশুর উপর ছিল ধর্মচক্র। ভগ্ন স্তম্ভশীর্ষকে আসল স্তম্ভশীর্ষ বলে চালিয়ে দিয়েছেন ভারত সরকার। যে লোক মূলত খাঁটি নয়, তার দৃষ্টিও স্বচ্ছ নয়। জন্ম লগ্নেই ভারত সরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা কোন্ পথে চলবেন। সারা ভারতে পশুশক্তির এত বড় জয় আর হয়নি। তাই বলছিলাম, ভারত সরকারের হিন্দুধর্মের স্বীকৃতি জাতীয়পতাকায় আশোকচক্রের স্বীকৃতির মতই বিকৃত।

—তাহলে আপনি বলতে চান হিন্দু ধর্ম বলে কোন ধর্ম নেই?

—না।

—এটা তাহলে কি?

—হিন্দু ধর্ম, ধর্ম নয়, এটা একটা সংস্কৃতি মাত্র।

—আপনার এরকম ধারণার কারণ?

জিজ্ঞাসা করলাম, ধর্ম অর্থাৎ অধ্যাত্ম ধর্ম বলতে আপনারা বোঝেন কি? কোন একজন ধর্ম প্রচার করেছেন এই তো। যেমন, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর জিন, যিশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ এই রকম। বুদ্ধ থেকে বৌদ্ধধর্ম, জিন থেকে জৈনধর্ম, খ্রীষ্ট থেকে খ্রীষ্টধর্ম, মহম্মদ থেকে

-মহাম্মেডান বা মুসলমান ধর্ম। এরকম কোন 'হিন্দু নামধারী ব্যক্তি কি কোন ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন, যাকে বলা যায় হিন্দুধর্ম? ইংরেজীতে যাকে বলে Creedal religion!

দেখলাম, সমবেত সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ী করছেন। একজন বললেন, তাহলে আমাদেরটা ধর্ম নয়?

—ধর্ম ঠিকই। তবে কোন Creedal religion নয়। ধর্ম অর্থ ধারণ করা। যে সত্যধর্ম যথার্থ মনুষ্যত্বকে ধারণ করে রাখে, আমাদের হিন্দের অর্থাৎ ভারতের সংস্কৃতি সেই অর্থে ধর্ম। যথার্থ মনুষ্যত্বকে ভারতীয় সংস্কৃতি ধারণ করে রেখেছে। সত্যের উপর নির্ভরশীল বলেই এ সংস্কৃতি বড় উদার।

একজন প্রশ্ন করলেন, এ সত্যের স্বরূপ কি?

আমি বললাম, জানিনা। কিন্তু আমি যথার্থই তা জানতে চাই। তবে আপনারা যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরেছেন, আমি তাকে মানিনা। মানিনা বেদের অভ্রান্ততা, মানিনা বর্ণভেদ। আপনাদের কথা যেমন মানিনা, তেমনি পশ্চিমী দার্শনিকদের অপব্যাখ্যাও মানিনা যে, ভারতীয় ধর্ম Negative, জীবনকে অস্বীকার করা, অর্থাৎ life-Negation. সম্ভবত বৌদ্ধদের শূন্যতাবাদ বা শঙ্করের মায়াবাদ অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা এই তত্ত্ব থেকে এরম ধারণা এসেছে।

একজন বললেন, আপনি তো সাংঘাতিক মশাই, আমাদের বৈদিক বিধান, চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম, আমাদের সমাজের যা কিছু ভিত্তি তার কিছুই মানেন না।

আমি বললাম বৈদিক বিধান বলে কোন বিধান নেই। চতুর্বর্ণ, মানুষের সৃষ্টি, তবে চতুরাশ্রম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

—বৈদিক বিধান নেই তো, আমরা কোন বিধানে চলি?

—বেদ আর্যদের সৃষ্টি বলেই আমাদের ধারনা। যদিও বৈদিকস্তোত্রে অনেক ক্ষেত্রেই অনার্যরাও অংশ গ্রহণ করেছেন। অনেক অনার্য দেবদেবী আর্যদের বৈদিক স্তোত্রে ঢুকে গেছেন, যেমন উষা। উষাকে এক সময়

ইন্দ্র তাড়না করেছেন, অথচ এই উষাই বৈদিক দেবী হয়ে বেদে আসন গ্রহণ করেছেন। এমন অনেক আছে। যে বৈদিক বিধান মেনে আমরা চলি তার অনেকটাই অনার্য। যেমন পূজা পদ্ধতি। পূজার চিন্তাটাই অনার্য। শুধু যজ্ঞের চিন্তাটাই আর্যদের। তবু যে কোনো মহান কল্পনায় এটা উদ্বুদ্ধ, তা নয়। যজ্ঞের একটা ইতিহাস আছে, যদিও 'যজ' ধাতু থেকে যজ্ঞ শব্দের উৎপত্তি এরকম একটা বিশ্বাস পরে প্রচলিত হয়েছে। 'যজ' ধাতু অর্থাৎ ত্যাগ করা। এই ত্যাগ থেকেই যজ্ঞের উৎপত্তি। প্রিয় বস্তুকে যজ্ঞের অগ্নিতে দেবতার কাছে ত্যাগ করাই স্থূল যজ্ঞের মূল লক্ষ্য। কারণ, এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা নিজেকে ত্যাগ করে বা বলি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন এই মহাজগৎ। কিন্তু ব্যাখ্যা এর যাই হোকনা কেন, এর পেছনে আছে একটা ইতিহাস। শীতার্ত মধ্য এশিয়ার অঞ্চলে সারাদিন পশুচারণার পর আর্যরা সন্ধ্যাবেলায় বণ্যপশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আগুণ জ্বালিয়ে তার চার পাশে বসে মনের আনন্দে গান করত। গানের বিষয় ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি। এই সময়ই তারা অগ্নিকুণ্ডে মৃতপশুর মাংস পুড়িয়ে খেত। এই অগ্নিকুণ্ডের চার ধারে বসে গান করা থেকেই ঋক বা শ্লোক-বেদ গড়ে উঠে। অগ্নি পবিত্র ও মহামূল্যবান হয়ে দেখা দেয়। যজ্ঞপদ্ধতি গড়ে উঠে। আমাদের মধ্যে সেই যজ্ঞপদ্ধতিটা টিকে থাকলেও আমাদের সমাজের অধিকাংশ রীতিনীতি অনার্য ভাবধারা দ্বারা পুষ্ট। লৌকিক আচারের প্রায় সবগুলিই প্রাগার্য। যেমন বিয়ের কনের গাত্র হরিদ্রা থেকে শাঁখা সিঁদুর সবই অনার্য। ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করার নিয়মটা পর্যন্ত। আমাদের খাবার দাবার পোশাক পরিচ্ছদ এসব তো কোনটাই আর্যদের নয়। সুতরাং বৈদিক বিধান বলতে আমাদের জীবনে প্রায় কিছুই নেই।

—চতুর্বর্ণ?

—চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা আর্যদের। ভারতে আসার আগে ইরাণেও তাদের এই বর্ণভেদ ছিল, তবে তখন বর্ণভেদ নয়, ছিল শ্রেণীভেদ।

সমাজ বিভক্ত ছিল পুরোহিত, রথী, কর্ষক ও কারিগরের মধ্যে। সেটাই আমাদের দেশে হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ভারতে বস্তুত পুরোহিতরা হল ব্রাহ্মণ, রথী ক্ষত্রিয়, কর্ষক ও কারিগর হল বৈশ্য। শূদ্রেরা এদেশের পরাজিত অনার্য, আর্যদের দাস। তারা হল তিন আর্যশ্রেণীর সেবক, দাস বা শ্রমিক। তাদের কৃষ্ণ বর্ণ যাতে আর্যদের গৌর বর্ণের সঙ্গে মিশে না যায় সেইজন্য বর্ণ ব্যবস্থার সৃষ্টি। এবং এই ব্যবস্থাটাও বিশেষ করে এসেছে যজুর্বেদের পর্যায়ে, যখন আর্যরা কৃষিকাজ সবে আরম্ভ করেছে এবং তখনও পশুচারণা করে চলেছে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণব্যবস্থার উৎপত্তির কথা থাকলেও এটা ঋগ্বেদে পরের সংযোজন। আসলে সামাজিক স্বার্থ যত বেড়েছে, বর্ণভেদের কড়াকড়িও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল আর্যসমাজে বর্ণভেদ ছিল প্রথমে বর্ণভিত্তিক পরে কর্মভিত্তিক, তার পরে হয়েছে জন্মভিত্তিক। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সমাজেও এ ব্যবস্থাটা স্থায়ী ছিলনা। কর্মক্ষেত্রের জন্যই শ্রেণীবিভাগ, আগেরও নয়, পরেরও নয়। গুরুগৃহে শিক্ষাকালে আর্যদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিলনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্তান সমান মর্যাদায় গুরুগৃহে থাকত। গার্হস্থ্যাশ্রমে ছিল কর্মের ভিত্তিতে বর্ণভেদ। বানপ্রস্থাশ্রমে সেটা হত শিথিল। সন্ন্যাসাশ্রমে মানুষে মানুষে কোন ভেদই থাকত না। সুতরাং কেউ যদি জন্মভিত্তিক বলে বর্ণ-ব্যবস্থাকে মনে করেন, তাহলে তাকে আমি ঘৃণাই করব। বর্ণ মূলতঃ এসেছিল দেহের বর্ণ থেকেই। যার রঙ সাদা তিনি ব্রাহ্মণ, পীতবর্ণের লোক ক্ষত্রীয়, গোলাপী বর্ণের লোক বৈশ্য ও কৃষ্ণবর্ণের লোক শূদ্র।

সকলেই বুঝলেন, কাকে লক্ষ্য করে আমি কথা কয়টি বলছি। কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে বললাম এতে তাঁর প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাসে চির ধরেছে বলে মনে হলনা। শুধু না জানার অপরাধে তিনি ক্রোধে থম থম করতে লাগলেন।

একজন বললেন, বর্ণ ব্যবস্থা আপনি মানেন না বুঝলাম। কিন্তু আশ্রমব্যবস্থাটাকে আপনি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন কেন?

বললাম, আশ্রম ব্যবস্থার একটা তাৎপর্য এই যে, এতে ভারতীয় বিশ্বাসের একটা সত্য লুকিয়ে আছে। শঙ্করাচার্য যাই মনে করুন না কেন, ভারতীয়েরা এই জীবনটাকে মিথ্যে মনে করেন না, আবার সম্পূর্ণ সত্য বলেও ধরেন না। সত্য মিথ্যেয় জড়িত যে সত্য সেটাই ভারতীয় সাধনার মূল লক্ষ্য। এইজন্য সংসারকে শুধুমাত্র 'সঙ' বলে না ভেবে 'সার' বলেও ভাবা হয়েছে। আবার শুধুমাত্র 'সার' বলে না ভেবে 'সঙ' বলেও চিন্তা করা হয়েছে।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম ?

বললাম, দেখুন, সংসার মিথ্যে নয় বলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তাঁকে ভোগ করার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা আছে। গার্হস্থ্যাশ্রমে ভোগ। এটাই সব সত্য নয়, ফলে একে ত্যাগ করার জন্য আছে বানপ্রস্থাশ্রমে ত্যাগের প্রস্তুতি। সন্ন্যাসাশ্রমে আছে সম্পূর্ণ ত্যাগের ব্যবস্থা। জীবন সম্পর্কে ভারতবর্ষের এটাই খাঁটি চিন্তা। এখানে চার্বাকেরও চূড়ান্ত স্বীকৃতি নেই, গৌতম বুদ্ধেরও নেই। এখানে বস্তু ও বস্তুর অতীত দুইই রয়েছে। তাই মোক্ষ এখানে শুধু মোক্ষ নয়—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

একজন বললেন, বেদকে আপনি তাহলে ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করেন না ?

—না। আমি মনে করি ঋগ্বেদের পর্যায়ে বেদ একটি মহান কাব্যগ্রন্থ। সত্যকে ছোঁবার জন্য এখানে একটা প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু ছোঁয়া যায়নি। নাসদীয় সূক্ত ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়, যেখানে সৃষ্টি-রহস্যের উৎসে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

একজন প্রশ্ন করলেন, অথর্ব বেদ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?

বললাম, অথর্ব বেদ অনার্য ভাবধারা পুষ্ট। এজন্য একসময় অথর্ব বেদ স্বীকৃতি পায়নি। তবে এর মধ্যে উচ্চতর দার্শনিক কল্পনা বেশি আছে। অথর্ব বেদ উপনিষদের পূর্বাভাষ বলেই আমার ধারণা। অথর্বন ও অঙ্গিরস দু'জনে মিলে সৃষ্টি করেছিলেন অথর্বাঙ্গিরস বেদ। পরে অঙ্গিরসের নাম মুছে যায়। অথর্বনের নামে এই বেদ প্রচলিত

হয় অথর্ব বেদ নামে। সম্ভবত এই বেদের উদ্গাতা ইরানের আথ্রবণ ব্রাহ্মণেরা। এঁরা পূর্ব ইরাণের অধিবাসী। ভারতের সন্নিকটবর্তী। ইরাণের আসল ব্রাহ্মণ হল 'মগ' বা Magianরা। রাজা ক্যাম্বিসেস বা কম্বুজিবের পরাজয়ের পর দারায়ুস যখন এদেশের শাসনকর্তা হন তখন 'মগ' ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা কমে যায়। আথ্রবণ ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা বাড়ে। এদের প্রভাবেও অথর্ববেদ সৃষ্টি হতে পারে। এই বেদই বৈদিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূত্রপাত। এর পরই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক পেরিয়ে উপনিষদের সৃষ্টি।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, উপনিষদ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

—এই শব্দটুকুব মধ্যেই সত্য নিহিত আছে।

—কি বকম?

—বললাম, উপনিষদ অর্থ কি?

দেখলাম, উপস্থিত কেউ তা বলতে পাবলেন না। আমি জানি তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে নিজেদের নিয়ে গর্ব করেন। কিন্তু আসলে কিছু খোঁজ খবর রাখেন না। সুতরাং আমি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিলাম। বললাম, উপনিষদ অর্থ হচ্ছে উপ+নি +ষদ অর্থাৎ, উপ অর্থাৎ নিকট, নি অর্থাৎ নির্ভুলভাবে, ষদ অর্থাৎ বিদীর্ণ করে দেওয়া। অর্থাৎ নির্ভুলভাবে নিকটে বিদীর্ণ করে দেওয়া। অর্থাৎ দূরত্ব এতটুকু না রেখে ভ্রান্তিকে নির্ভুলভাবে বিদীর্ণ করাই হল উপনিষদ, অর্থাৎ এককথায় উপনিষদ অর্থ হল 'সত্য জ্ঞান'। তবে উপনিষদে যেখানে তর্ক সেখানে জ্ঞান নেই। পূর্ণ জ্ঞানের ছাদে ওঠার জন্য সিঁড়ি আছে। যেখানে পূর্ণ জ্ঞান আছে, সেখানে তর্ক নেই। যেমন, ঋষি বামদেব যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি বলে উঠেছেন—আমিই মনু, আমিই সূর্য, আমিই বুদ্ধিদীপ্ত কক্ষিবত। আমিই কবি উশনস, আমাকে দেখ। আমি পার্থিব জগৎ আর্যদের দান করেছি। আমিই যজ্ঞে আহুতি দানকারীকে দিয়েছি বৃষ্টি। আমিই করি বজ্র নির্ঘোষে ধারাপাত। সকল দেবতা আমারই নির্দেশ পালন করেন।

মহিলা ঋষি বাক্‌ও এই সত্য উপলব্ধি থেকে বলে উঠেছিলেন—আমি সমগ্র জগতের অধিশ্বরী, সর্বসম্পদ প্রদায়িনী। আমিই সত্যদ্রষ্টা, পূজনীয়দের মধ্যে আমিই সর্বাগ্রা। দেবতারা আমাকে নানা লোকে স্থাপন করে দেখেন, কারণ আমার অধিষ্ঠান নানা লোকে। বিভিন্ন প্রাণের মধ্যে আমিই বাস করি।' কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য যখন তর্কের পথে এগিয়েছেন, তখনই তিনি বামদেব ও বাকের মহিমা হারিয়ে ফেলে গার্গীকে ধম্‌কে উঠেছেন, 'আর এগিও না। তোমার মাথা খসে পড়বে।' তর্কে নয়, অনুভবেই উপনিষদের সিদ্ধি।

একজন বললেন, আপনি কি করে এটা বুঝলেন?

বললাম, বুঝিনি, আমার অনুভব থেকে একথা বলছি। বোঝার জন্য আমার চেষ্টা চলছে মাত্র।

আর একজন বললেন, আপনি একটি সামান্য মানুষ। আপনি যদি আপনার অনুভবকে আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত বাণীকে আমাদের বিশ্বাস করতে বলবেন না কেন?

বললাম, ভগবান বলে কিছু নেই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নামে একটি নাম আছে। সে নামও এত বিভ্রান্তিকর যে তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করাই কষ্টকর।

—কি রকম?

বললাম, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বে স্বয়ং বিবেকানন্দই অবিশ্বাস করেছেন। তা ছাড়া দেশী বিদেশী নানা ভাবধারা শ্রীকৃষ্ণের রূপান্তর ঘটিয়েছে। বিবেকানন্দ মনে করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে এত ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ আছে যে, সব শ্রীকৃষ্ণকে এক শ্রীকৃষ্ণ বলে ভাবতে গেলে তাঁকে সহস্রায়ু বলে মনে করতে হয়। কিন্তু বেদেই বলা হয়েছে যে, পুরুষ শতায়ু। শতায়ু দেড়শ বছর বাঁচতে পারেন, দেড় হাজার বছর কোন ক্রমেই নয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্পর্কেই যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মথুরার শ্রীকৃষ্ণ অনার্য থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। কৃষ্ণবর্ণের এই

গোপীবল্লভ মহাপুরুষটির আগমন ঐতিহাসিকদের মতে দক্ষিণ-ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চল থেকে। তিনি দক্ষিণ-ভারতের আভিরদের মায়ন দেবতা—যিনি বাঁশী বাজাতেন এবং গোপবালাদের নিয়ে লীলা করতেন। আভিরেরা কালক্রমে দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে চলে আসে। মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে তারা বসবাস করতে থাকে। আভিরদের মায়ন দেবতার গল্পকাহিনী মথুরা অঞ্চলে বেশ ছড়িয়ে প'ড়ে গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী তৈরি করেছে। ভারতীয় অনার্যদের এই মায়ন দেবতার সঙ্গে নানা বিদেশী গল্পকথার মিলন হয়ে তাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। দেশী বিদেশী প্রাচীন কোন কোন গল্পও জুটে গেছে নানা স্থানে।

একজন বললেন, বিদেশী গল্প কথা কি জুটেছে?

বললাম, গ্রীসের হারকিউলিসের কাহিনী, এচিলিসের কাহিনী, এই সব সুন্দর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। যেমন ধরুন, হারকিউলিস অল্প বয়সেই বহুমস্তকযুক্ত সর্পকে হত্যা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনে তার প্রভাব পড়েছে। ট্রয়যুদ্ধের অন্যতম নায়ক এচিলিসের একটি মাত্র দুর্বলতা ছিল। তাঁর পায়ের গোড়ালী ছিল অরক্ষিত। প্যারিস সেই দুর্বল স্থানে তীর ছুঁড়ে তাঁকে হত্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ পায়ের নিচে ব্যাধ নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে নিহত হয়েছিলেন। মায়ের জন্য পায়ের নিচু ছাড়া তাঁরও সারা দেহ ছিল দুর্ভেদ্য। তা ছাড়া ঐতিহাসিক কোন কোন ঘটনারও ছায়াপাত ঘটেছে সেখানে।

—কি রকম?

বললাম, গ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিডিয়া অর্থাৎ বর্তমান ইরাণের সঙ্গে দীর্ঘদিনের জন্য একবার লিডিয়ার যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের ষষ্ঠবর্ষে হঠাৎ একবার যুদ্ধের মাঝখানে সূর্যগ্রহণের ফলে বিনা মেঘে মধ্যদিন নিশীথরাত্রিতে পরিণত হয়ে যায়। সেই অঘটনে চমকে গিয়ে যুদ্ধমান উভয়পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। মহাভারতের জয়দ্রথ বধের সময় সম্ভবতঃ এই ধরনের কোন আকস্মিক সূর্যগ্রহণ অর্জুনের জীবন রক্ষা করেছিল।

এই প্রাকৃতিক ঘটনাটিকে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার দেখুন দেশী একটা পুরানো ব্যবস্থা কি করে গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে হোলী উৎসবের মধ্যমণিতে পরিণত করেছে। হোলী উৎসব মূলত ছিল প্রাচীন ভারতের বসন্তোৎসব। এই বসন্তোৎসবই হোলীউৎসবের রূপ নিয়েছে। হোলীর আগে বুড়ির কুড়ে পুড়ানোও পুরানো এক প্রথার রূপান্তর হিসেবে এসেছে। প্রাগৈ-তিহাসিক প্রাচীন উপজাতীয়রা যৌন চেতনা জাগরণের জন্য একসময় উৎসবাগ্নী জ্বেলে তার চারদিকে ছেলেমেয়ে মিলে নৃত্য করত। এমন অবস্থার নৃত্য করতো যাতে যৌন ক্ষুধা জাগে। কারণ সে সময় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দরিদ্রজীবনের জন্য এবং অত্যন্ত কঠোর জীবন সংগ্রামের জন্য যৌন ক্ষুধা তেমন জাগত না। তাই উৎসবাগ্নিকে ঘিরে এমন কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী করা হত যাতে যৌন ক্ষুধা জাগে। শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা ও বুড়ির কুড়ে পোড়ানোর মধ্যে সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের একটি উৎসব রূপান্তরিত অবস্থায় রয়েছে।' একজন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ মুখনিসৃত গীতার বাণীকে আপনি অস্বীকার করতে চান?

বললাম, গীতার বাণী শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত, একথাতে আর যাঁরাই বিশ্বাস করুন, ঐতিহাসিকেরা করেন না। মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও এটা আদৌ সম্ভব নয় যে, যখন যুদ্ধ আরম্ভ হব হব, যখন প্রচণ্ড একটা টেনশন চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে গীতার মত একটা দুরুহ তত্ত্বের কথা কেউ মনযোগ দিয়ে শুনবেন। আসলে ব্যাপার হল এই যে, সে পর্যন্ত অধ্যাত্ম ভারতে যত বড় বড় ধর্মচিন্তা আত্মপ্রকাশ করেছিল মহাভারতকার সেই সব চিন্তার সারাংশটুকু শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে রেখে গেছেন। যার ফলে শ্রীকৃষ্ণে অনেক পরস্পর বিরোধী ভাবও আছে। গীতার পবিত্র জীবন, অহিংসা, নির্লোভ, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কিত বক্তৃতার পর তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যখন প্রশ্ন করেছিলেন : অহিংসাই যদি বড়, আমাকে তাহলে তুমি হত্যায় উদ্বোধিত করছ কেন, শ্রীকৃষ্ণ এর কোন স্বচ্ছ জবাব দিতে পারেননি, প্রসঙ্গান্তরে চলে

গিয়েছিলেন। তখন বিশ্বরূপ দেখিয়ে নিজের সর্বময় কর্তৃত্বের কথা বলেছিলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, বিশ্বরূপ দর্শনে আপনি বিশ্বাস করেন না?

বলেছিলাম, না। যা ঘটেনি, তা দেখানো অসম্ভব।

একজন বললেন, আপনার কথাতে মনে হচ্ছে, গীতা কারো নিজস্ব সৃষ্টি নয়, শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত তো নয়ই। গীতাকে তেমন মূল্যবান গ্রন্থ বলে মনে হচ্ছে না। তা যদি হয়, তাহলে গীতার এত প্রাধান্য কেন ভারতবর্ষে, এত জনপ্রিয়তা কেন?

বললাম, ইতিহাসের দিক থেকে এরও জবাব আছে।

—বলুন।

—গীতার অবিশ্বাস্য সাফল্যের মূলে রয়েছে ভক্তিসূত্র। এই ভক্তি-সূত্রে, এক দেবতায় একান্ত নির্ভরতা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গীতা হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের একটি মৌল চিন্তা। আর তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনের পর অহিংসার ধ্যান ধারণা এত প্রাধান্য লাভ করেছিল করেছিল যে, ভক্তিসূত্রের সঙ্গে অহিংসার এই প্রাধান্যও গীতার পপুলারিটির আর একটি কারণ।

আমার কথা অধিকাংশেরই মনঃপুত হলনা বুঝতে পারলাম, তবে এর জবাবও তারা দিতে পারছেন না এটা বুঝতেও অসুবিধা হল না। চাপা আক্রোশে অনেকেই ফুঁসতে লাগলেন।

একজন বললেন, আপনি যা বলছেন, তাতে তো আমাদের সব কিছুই বোগাস হয়ে দাঁড়ায়। এই যে পুরোহিতমশাই ঘটে সিঁদুর দিয়ে, ঘটের মাথায় আমের পল্লব বসিয়ে পুজো করছেন তাও তাহলে অর্থহীন?

বললাম, জিনিসটি অর্থহীন নয়। কিন্তু পুরোহিত নামধারী যে মূর্খটি এর সামনে বসে আছেন তিনি এর অর্থ জানেন না। ভাবেন ঘটের মধ্যে ভগবান এসে বসে থেকে গোটা পৃথিবীকে উদ্ধার করছেন।

একজন তরুণ গোছের মানুষ এতক্ষণ মুখ খোলেননি। ভাব দেখে মনে হয় সিংহ রাশির লোক। কেউ কারো উপর টেক্কা দিয়ে যাবে তিনি এটা পছন্দ করেন না। অথচ টেক্কা দেওয়া হলে তা বন্ধ করার মন্ত্রও তাঁর জানা নেই। সেই জন্য তিনি ক্রমশঃ বেশি রাশ ভারি হয়ে উঠছিলেন। যেন এসব আলোচনার তার কাছে কোন মূল্যই নেই, এমন ভাব। এবার তিনিই মুখ খুললেন, আপনি কি এর অর্থ জানেন ?

বললাম, জানি।

এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটি বললাম যে, তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেন, বাধ্য হয়ে বললেন, তাহলে আপনি বলুন।

বললাম, ঘট হল উদরের প্রতীক। অর্থাৎ মাতৃশক্তির প্রতীক। এই মাতৃশক্তিকে প্রাচীন কালে উর্বরা শক্তির অধিশ্বরী কল্পনা করে শস্যের জন্য পূজো দেওয়া হত। পূজো হত বলি দিয়ে। ঘটের পেটে যে সিঁদুরের ফোটা ওটা রক্তের প্রতীক, অর্থাৎ বলির প্রতীক। ঘটশীর্ষে আম্রপল্লব হচ্ছে শস্যের প্রতীক। আসলে এটা হল ফার্টিলিটি কাল্টের একটি অঙ্গ।

তরুণ গোছের মানুষটি আর কোন জবাব দিতে পারলেন না।

একজন তখন সামান্য বিদ্রূপের ভঙ্গী করে বললেন, তাহলে আমাদের এই যে বার মাসের তের পার্বন তার কোন সামাজিক ভিত্তিই নেই ? দুর্গাপূজা, কালীপূজা সবই মিথ্যা ?

বললাম, নিশ্চয়ই মিথ্যা। এসব এসেছে দেশবিদেশের গল্প কথা থেকে। কিছুটা ভীতি থেকেও। প্রাচীনদের fertility cult থেকে।

—'কি রকম ? আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম, এই দুর্গার কথাই বলছি, শুনুন না। দুর্গাপূজো আমাদের দেশে হয় মহিষাসুরমর্দিনীরূপে। ঠিক একই ধরনের মহিষাসুরমর্দিনীরূপে স্ত্রীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ভূমধ্য-

সাগরীয়দের মধ্যে। ভূ-মধ্যসাগরীয়দের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাইরগো বলে এক দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন রীতিমত যুদ্ধবিলাসিনী। ভূমধ্যসাগরীয় এই প্রাচীন মানুষদের শত্রু ছিল মনক্ষের বলে এক জাতি। মনক্ষেরদের প্রতীক ছিল মোষ। দেবী ব্যাইরগো মোষ-পালক এই মনক্ষের অসুরদের পরাজিত করে ভূমধ্যসাগরীয়দের রক্ষা করেছিলেন। মোষপালক মনক্ষের অসুরদের মহিষাসুর আখ্যা দিলেও ভুল হয় না। দুর্গা আর ব্যাইরগো দুয়ের মধ্যেও আছে উচ্চারণগত সাদৃশ্য। তাছাড়া এরকম সিংহবাহিনী দেবী দেশ বিদেশে নানা জায়গাতেই ছিল। ক্যাপ্পাডোসিয়ান দেবী 'মা'-ও সিংহ বা চিতাবাঘারূঢ়া। আমাদের শিবের মত তাঁর স্বামীও বৃষবাহন। তাঁর হাতেও আমাদের শিবের হাতের ত্রিশূলের মত বজ্রত্রিশূল। মূলতঃ তিনিও উর্বরাশক্তির প্রতীক। দুর্গাপূজার নবপত্রিকার যে শস্যবধূ সে এই fertility cult-এর দিকেই ইঙ্গিত দেয়।

একজন বললেন, কালীর সঙ্গেও কি বিদেশের যোগাযোগ আছে?

বললাম, দেশবিদেশের যোগাযোগ আছে। এই রহস্যময়ী দেবীও ফার্টিলিটি কাল্টেরই প্রতীক। তাঁর সামনে বলি দেবার যে রীতি তা দেখেই এরকম মনে হয়। ইউরোপ, আফ্রিকা সর্বদেশেই একসময় এধরনের দেবীর পরিচয় পাবেন। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে, এবং মহেন-জো-দড়ো হরাপ্পা থেকে দক্ষিণ ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই এধরনের দেবীর অস্তিত্ব ছিল। শুধু তাঁদের পায়ের নিচে শিব ছিল না এই যা। যে দেবী তাঁর পায়ের নিচে স্বামীকে রাখেন তিনি কত বড় দজ্জাল একবার তা চিন্তা করুন। তাঁর ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে ভক্তি না হোক ভয় করবে সকলেই।

একজন বললেন, আপনি যা-ই বলুন না কেন, আমি আমার ধর্মে বিশ্বাস করি। দেবদেবীতে বিশ্বাস করি। কারণ প্রত্যক্ষভাবে আমি এঁদের শক্তির পরিচয় পেয়েছি। আমার এক আত্মীয় সেবার কামাখ্যা ৺মায়ের পূজো দিয়ে······

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি বললাম, এই যে কামাখ্যা দেবী, এঁর সম্পর্কেই ধরুন না কেন। আপনারা তো বলবেন সতীর দেহের এক বিশেষ অংশ থেকে তাঁর সৃষ্টি। কামগিরি পাহাড়ের দেবী বলেই তিনি কামাখ্যা। কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি হলেন ও অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের দেবী। কামাখ্যাকে নীলাচলবাসিনী বলেও অনেকে উল্লেখ করেন। আসামের লোকেরা তাঁকে বলে 'আই' দেবী। 'আই' অর্থ মা। এই 'মা'-ই অস্ট্রিক ভাষার উচ্চারণে কামাখ্যা। কম্বোজের অস্ট্রিক মনক্মেরদের ভাষায় কামাখ্যার উচ্চারণ এইরকম— কা-মেই-খা। 'কা' মানে স্ত্রী, 'মেই' মানে মা, এবং 'খা' মানে জন্ম দাত্রী। এককথায় এর অর্থ দাঁড়ায় পিতামহী বিশ্বমাতা। ইনিই আসামে অঞ্চলে কোন কোন উপজাতির কাছে কাছাইখাতি দেবী। সুতরাং আপনি যে গল্পে নির্ভর করে কামাখ্যাকে বিশ্বাস করেন সে গল্পের ভিতই ঠিক নয়।

দেখলাম এবার কেউ কোন কথা বললেন না। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস থেকে এক ইঞ্চিও সরে গেছেন এরকমও মনে হলনা। বিশ্বাস ভ্রান্ত হোক অভ্রান্ত হোক সহজে লোকে তার কাছ থেকে সরে আসতে চায় না। একদিন সতীদাহের মত জঘন্য প্রথাকেও এদেশের লোকেরা পুণ্যকর্ম বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন বিশ্বাসে আটকে থাকার ব্যক্তি আমি নই, আমাকে কেউ যদি বিজ্ঞান দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন আমাদের ধর্মের প্রকৃতি, বুঝব। অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে যদি কেউ পারেন বিশ্বাস করাতে, করব। নয়তো মানুষে মানুষে যে-ধর্ম ভেদ সৃষ্টি করেছে, সে ধর্মে বিশ্বাস করব না। পুতুল পূজা করে পরকালের পথ প্রশস্ত করার মত মূর্খামী দেখাব না। অন্ধবিশ্বাসের চাইতে অবিশ্বাসও সহস্রবার ভাল বলে আমি মনে করি। আমি সত্যের সন্ধান করে চলব। ব্রাহ্মণ আমার কাছে অচ্ছুৎ থাকবে, যতদিন তাঁরা বর্ণভেদে বিশ্বাস করবেন। সুতরাং গৃহস্থের বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ না করেই চলে এলাম।

তিন

বিশ্বাস করি না বটে কুসংস্কারে, বিশ্বাস করিনা বটে সেই সমাজ ব্যবস্থায় যে ব্যবস্থা মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে, তবু কোথায় যেন একটা দুর্বলতা আছে। মিথ্যার উপর যার ভিত, সে-তো টিকে থাকতে পারেনা বহুদিন। জগতে সমস্ত প্রাচীন ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থারই অবলুপ্তি ঘটেছে, কিন্তু কয়েক হাজার বছরের ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা ভারতবর্ষে আজও টিকে আছে। প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম পাঁচ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায় মুসলমান আক্রমণে। সাত বছরের মধ্যে ইরাণ তার নিজের প্রাচীন ধর্ম হারিয়েছে। মধ্য এশিয়াও ঐ একই সময় আত্মসমর্পণ করে মুসলমানদের কাছে। প্রাচীন ইউরোপীয় ধর্ম, রোমান ধর্ম, গ্রীক ধর্ম সবই খ্রীষ্টানদের কাছে নিজের আত্মবিলুপ্তি ঘটায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম সেই আদিকাল থেকে একই রকমভাবে টিকে আছে। শুধু যে নিজে টিকে আছে, তাই নয়, অপরকে অনেক কিছুই দিয়েছে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণা, খ্রীষ্টান ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের ধারণা মুসলমান ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। ভারতবর্ষ থেকে যে বৌদ্ধধর্ম চীনে ও জাপানে গিয়েছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিল আজও তা টিকে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দুধর্ম মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও অনেক প্রাচীন বিশ্বাস সঙ্গে নিয়েই মুসলমান হয়েছে। সুতরাং কি করে বিশ্বাস করি যে, এ ধর্মের আত্মশক্তি নেই! আবার প্রতি-পদেই যে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হয় তাকে মানিই বা কি করে! সুতরাং মুখে যত সমালোচনাই করি না কেন, অন্তরে অন্তরে একটা বিরাট অনুসন্ধিৎসা আছে এ ধর্ম সম্পর্কে।

ইতিহাস পড়ে আমার ধারণা, বাহ্যরূপে যেভাবে এ ধর্ম টিকে আছে

সে ধর্ম এটা নয়। অন্তরে কোথায় একটা সত্যের স্রোত গোপনে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। সেই স্রোতটাকে ধরতে না পারলে সেই সত্যকে জানা যাবেনা। এ ধর্মের বাইরে ঢেউ, অন্তরে সমাহিত সমুদ্র। এ ধর্ম সমুদ্রেরই মত উদার। অসংখ্য নদনদী যে ধারা নিয়ে এসে এ সাগরে পড়েছে তাদের কাউকেই এ ধর্ম ফিরিয়ে দেয়নি। অবান্তর পলিমাটি দিয়ে বদ্বীপ তৈরী করেছে, নির্মল স্রোতকে বুকে টেনে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সত্য যখন তিনি এ দেশের অন্তরাত্মার স্বরূপ বুঝে বলে উঠেছিলেন 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে যাবেনা ফিরে।' ভারতবর্ষ চিরকাল দিয়েছে আর নিয়েছে। এই দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই তার জীবন সার্থক। যেদিন সে দেওয়া ভুলেছে, নিতে ভুলেছে, সেই দিন, সেই মধ্যযুগেই তার অবলুপ্তি ঘটেছে। প্রাণের স্রোত স্থির হয়ে গেলে দেখা দিয়েছে জঞ্জাল। জমে উঠেছে শ্যাওলা। মার্কসীয় দর্শনের দ্বন্দ্ববাদের মত দেওয়া নেওয়া তত্ত্বটাও একটা সত্য তত্ত্ব। জীবন মানেই দেওয়া এবং নেওয়া। এর একটিকে বাদ দিলেই জীবনের অপমৃত্যু। চলা মানে শুধুই চলা নয়, থামা এবং চলা। নিঃশ্বাস শুধু নিলে হয় না ছাড়তেও হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই তত্ত্বটাকে কাজে লাগিয়ে একটি সঠিক সত্যে পৌঁছেছিলেন—যে তত্ত্ব মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। নিঃশ্বাস শুধু ভেতরে নিয়ে রাখলেই যেমন বাঁচা যায়না, তেমনই শুধু ছেড়ে দিলেও প্রাণ বাঁচেনা। সমাজ-সত্যের কাছেও এটা একটা খাঁটি কথা। রাজতন্ত্র যতদিন দিতে ও নিতে জানত ততদিন বেঁচে ছিল। যেদিন শুধু নিতে গেল, দিতে চাইল না সেদিনই তার মৃত্যু হল। পুরোহিত শ্রেণী যেদিন তাঁদের বিদ্যাকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতে চাইল, দিতে চাইল না, সেদিনই তাঁদের অপমৃত্যু হল। তাঁর সত্যজ্ঞানের দেহে অবিদ্যার ধুলো লাগল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় শেষে সমাজে এখন বৈশ্যদের প্রাধান্য চলেছে। বৈশ্যরাই হল ধনতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের ধারক। কিন্তু এই ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র যখন যে দেশে সমস্ত সুযোগ সুবিধা শুধু নিজেরা নিতে চেয়েছে, দিতে

চায়নি অপরকে, তখনই তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব দেখা দিয়েছে। রুশ-বিপ্লব ও চৈনিক বিপ্লব তারই জ্বলজ্যান্ত সাক্ষ্য। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ-ভারতবর্ষ, ক্ষত্রিয়-ভারতবর্ষ, বৈশ্য-ভারতবর্ষ আজ নেই। তাই অপমৃত্যুর শব নিয়ে আমাদের কারবার। তাই যে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের কাছেই এ দেশের সমাজ ও ধর্মব্যবস্থাকে মনে হয় অসংস্কৃত, অসভ্য। কিন্তু এই অসভ্যতা ও অসংস্কৃতি তার উপরের ঢেউ, ভেতরের নয়। সমুদ্র চিরসত্য ঢেউ মিথ্যা। কিন্তু সত্যের আচ্ছাদন হিসেবে যে মিথ্যা, তাও টিকে থাকে। কিন্তু সেই মিথ্যেটাকেই সত্য বলে ধরে নিলে বিভ্রান্তিই বাড়ে। কখনও সত্যদর্শন হয় না। ভারতবর্ষের এই অন্তর্নিহিত সত্যকে জানতে হবে।

ভারতবর্ষের এই অন্তর্নিহিত সত্যকে কি করে জানা যাবে? বেদ বেদান্ত বা উপনিষদ ষড়দর্শন পড়ে? বেদ পড়ে অন্ততঃ আমার কোন সত্য দর্শন হয়নি। বেদের সংহিতা পর্ব সৎ কবির হৃদয়ের অনুরণনের প্রকাশ। উপনিষদে বোঝাবার জন্য আলোচনা আছে। আলোচনার শেষ নেই। আলোচনায় কোথাও না কোথাও একটা ফাঁক থেকে যায়ই। কথায় এবং ভাষায় কথার অতীত ও ভাষার অতীত জিনিষকে বোঝানো যায় না। সীমিত ভাষা দিয়ে অসীমকে বোঝানো যাবে কি করে? এসব সেই মহাসত্যে পৌঁছুবার কয়েকটি ধাপ মাত্র। চূড়ান্ত নয়। ষড়দর্শনে ব্রহ্মবিদ্যার চেয়ে তর্কবিদ্যা বেশি, সুতরাং পূর্ণ তৃপ্তি ষড়দর্শনও দিতে পারেনা। স্পষ্ট বোঝা যায়—ভাষার অতীত সেই 'সত্য' ভাষার মধ্যে নেই। তথাকথিত গুরুজী, যাঁরা লোকালয়ে আসেন, কাগজে কলমে নিজেদের ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করেন তাঁরা কাউকে কোন 'সত্য' দিতে পেরেছেন বলে শুনিনি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা নাম করা তাঁরা দেখি বড়লোককেই করুণা করেছেন বেশী। যিশুখ্রীষ্টের সেই কথাটিই অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে—যেখানে তিনি বলেছেন যে, ছুঁচের ছিদ্রপথে উটের পক্ষে গলে যাওয়া সম্ভব হলেও ধনবান ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গের দুয়ার পেরুনো

অসম্ভব। আমি ফরাসী সমাজতন্ত্রবিদ প্রুধোঁ'র কথাতে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, সম্পদ মানেই অপহরণ। অপরের জিনিষ লুণ্ঠন না করে, প্রতারণা করে গ্রহণ না করে কেউ বড়লোক হতে পারেনা। সুতরাং মিথ্যার উপর যাদের বেসাতি এইসব গুরুজীরা যখন তাঁদেরই বেশি করুণা প্রদর্শন করেন তখন গুরুজীদের দাক্ষিণ্যের উপর বেশি আস্থা থাকে না। গুরুজী একজনকেই দেখতে চেয়েছিলাম, তখন তিনি ছিলেন কলকাতায়, তাঁর নাম মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। সাংবাদিক বাদল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী তাঁর শিষ্যা। আমায় বললেন গুরুদর্শন যদি করতে চান আমার সঙ্গে আসতে পারেন। আমি রাজি ছিলাম—কিন্তু বাদল-বাবু আপত্তি করে বললেন, যাবেন না, ব্যথা পাবেন। আমি যাইনি, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে গুরুজীকে গাড়ি করে যেতে দেখেছিলাম। আগে গাড়ি, পিছে গাড়ি, গুরুজী যাচ্ছেন মহাবিলাসে। তাঁর পাশে বসে তন্বী সুন্দরী শিষ্যারা, যাঁরা সোনার চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। গুরুজীর অঙ্গবাসের যা মূল্য একজন দরিদ্রের একমাসের আহার্যের ব্যবস্থা হতে পারে সে মূল্যে।

একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, এই হল গুরু, দেখুন। তাঁর বক্রোক্তি বা ব্যাঙ্গোক্তির লক্ষ্য ছিল গুরুজীর বিলাস, সুন্দরী তন্বী রমণীর সান্নিধ্য। কিন্তু আমার লক্ষ্য সেখানে ছিল না। বিলাসে থাকলেই কেউ সত্যজ্ঞানের অধিকারী হবেন না, তা নয়। রাজর্ষী জনক চরম বিলাসে দিন অতিবাহিত করতেন। কিন্তু তিনি কৌপীন সম্বল নারদের চেয়ে বেশি নিরাসক্ত ছিলেন। প্রশ্ন বিলাস নয়, প্রশ্ন সান্নিধ্য। করুণার যোগ্য কি শুধুমাত্র এই বিত্তবানেরাই? যিশুখৃষ্ট দাঁড়িয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। করুণা করেছিলেন সাধারণ মানুষকে, গুরু তিনিই। কিন্তু গৌতমবুদ্ধ সাহায্য নিয়ে-ছিলেন শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের। গৌতমবুদ্ধের অধ্যাত্ম সাধনা কত বড় জানিনা। কিন্তু তাঁর উত্থানের মূলে শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের অবদান ছিল। বস্তুত বৈদিক ব্রাহ্মণদের বর্ণবৈসম্য ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল তৎকালীন

বৈশ্য সম্প্রদায়কে। তাঁরা সম্পদ বিদ্যা ও বুদ্ধির অধিকারী হয়েও সমাজে অপাংক্তেয় ছিলেন। তাই তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ব্রাত্য ক্ষত্রীয় বংশোদ্ভূত গৌতমবুদ্ধ, তিনিও ক্ষুব্ধ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঘোরতর রক্ষণশীলতায়। তিনি বর্ণভেদ মানেননি। মানুষে মানুষে সমতার কথা বলেছিলেন। সামাজিক মর্যাদালাভের এই বিরাট সুযোগ বৈশ্যরা হাতছাড়া করতে চাননি। তারা গৌতমবুদ্ধেব পাশে এসে দাঁড়িয়ে একটা সামাজিক বিপ্লব সাধন করতে চেয়েছিলেন, ঠিক যে মানসিকতা থেকে ফরাসী বুর্জোয়া সম্প্রদায় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন। জানিনা, আধুনিক কালের গুরুজীর চেলারা তাদের গুরুদের মাধ্যমে কী কাজ সম্পন্ন কবতে চান। একাল বৈশ্যদের কাল। বিত্তশালী সম্প্রদায়ই বৈশ্য সম্প্রদায়ভূক্ত। সুতরাং যাঁরাই সমাজপতি তাঁরাই সামাজিক অন্যায়ের কি প্রতিবিধান করবেন? যারা লুণ্ঠনের উপর বেঁচে আছেন তাঁরা লুণ্ঠন ছেড়ে সাম্যের কথা বলবেন কি? শুধু এই কারণেই মোহনানন্দজীর উপর আমার সেদিন শ্রদ্ধা জন্মায় নি।

গুরু বড় লোকের আছে, মধ্যবিত্তেরও আছে। আমার এক নিকট আত্মীয় এসেছিলেন সেদিন। প্রতাপাদিত্য রোডে এসেছেন তাঁর এক আত্মীয়ের গুরুমা, তিনি নাকি আশ্চর্য সব কাজ করেন। তাঁর সেই ক্ষমতা দেখে অনেকেই তাঁর ভক্ত হয়ে গেছেন। বেশ শিষ্য সামন্ত জুটে গেছে। শূন্যে হাত পাতলেই হাতে তাঁব সিঁদুর আসে, সন্দেশ আসে। শিষ্যরা বিভ্রান্ত। গিয়েছিলাম দেখা করতে, ম্যাজিক তিনি দেখিয়েছিলেনও! কিন্তু তাতে আমার কি? তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম 'সত্য' কি বলতে পারেন? আত্মা পরমাত্মা কি বলতে পারেন? তিনি দেখলাম বাক্‌হীনা। এর কোন জবাব তাঁর জানা নেই। তাঁকে শুধু বলেছিলাম, সত্য না জেনে গুরুগিরি করা মহাপাপ। তাঁর শিষ্যরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু আমি ভয় পাইনি। কাগজে বহু প্রচারিত গুরুজীরা সাচ্চা ব্যক্তি নন, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভারত-

বর্ষের কোন কার্লমার্কস যদি বলেন ধর্ম হল লোকের আফিং, তবে এই সব লোকের জন্যই তিনি বলবেন। কালী, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু এঁরা যদি সত্যিই শক্তিশালী হতেন, তাহলে মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে পারতেন। সোমনাথের শিব আত্মরক্ষা করতে পারেননি সুলতান মামুদের আক্রমণের হাত থেকে। মথুরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণও কিছু করতে পারেননি। জ্বালামুখি কাংড়ার মহাশক্তিও নির্বাক ছিলেন এদের আক্রমণের মুখে। এইসব দেবত্মার নামে যাঁরা গুরু সেজেছেন, ভৈরব সেজেছেন, ভৈরবী সেজেছেন, অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাঁরা কেউ যথার্থ নন। রামকৃষ্ণের মত সাধক পেলে হয়তো কিছু টের পাওয়া যেত। তিনি মূর্তির মধ্যে মূর্তির অতীত জিনিষ দেখিয়েছিলেন। সেই ধরনের সাধক কি আছেন? যদি এক রামকৃষ্ণ হতে পারেন তাহলে আরও রামকৃষ্ণও সম্ভব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ছিলেন বিবেকানন্দ ও শ্রী'ম'। তাই তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সেণ্ট পিটার শ্রেণীর সাধক ও ম্যাথু, মার্ক, লিউক, জন ইত্যাদির মত প্রচারক ও বাইবেল লেখক ছিলেন বলেই যিশুখ্রীষ্ট। তাই বলে অন্য রামকৃষ্ণ নেই, অন্য যিশুখ্রীষ্ট নেই এটা বিশ্বাস্য নয়। শহরের ভিড়ে ঘন ঘিঞ্জিতে তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও কোন তীর্থের পবিত্র পরিবেশে, হিমালয়ের কোন নীরব গুহায় এঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। তাই ঠিক করলাম অন্ততঃ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তীর্থ ঘুরে দেখি।

পুজোর ছুটি হাতে পড়তেই তাই একদিন বেরিয়ে পড়লাম। শরতের কেমন একটা মধুর ছোঁয়া আছে, শরতের কোথায় যেন একটা অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ আছে। বাঙালীর মানসিকতায় এ সময় নতুন একটা সুর ঝঙ্কার দেয়। দুঃখ দৈন্য বেদনা কাটিয়ে বাঙালী এ সময় শারদোৎসবে মেতে উঠে। ঘটনাটা হয়তো কিংবদন্তী। দুর্গাটুর্গা আসলে হয়তো কোন কিছুই নেই। তবু কোনকালের গল্পকথা বাঙালীর মানসিকতাকে এমন-করে আচ্ছন্ন করে আছে যে, দুর্গাপূজা

-বাঙালীকে এক নতুন ভাবলোকে নিয়ে যায়। কোথায় এক মহাশক্তি আছেন, তিনি যেন বাঙালীকে করুণা করার জন্য এ সময় মর্ত্যে নেমে আসেন। যেমন আয়োজন চলতে থাকে মহাশক্তিকে বোধনের জন্য তেমনই নতুন নতুন দেশ-দেশান্তরও বাঙালীকে হাতছানী দিয়ে ডাকে, বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়।' আর্থিক সংকটে যে বাঙালীর পা দুটো প্রায় খোঁড়া, সেও বেরিয়ে পড়ে পায়ে নব বল পেয়ে। মহাশক্তি অজানাকে জানার কৌতূহলে তাকে নতুন প্রেরণা দেন। কেউ বেরয় তীর্থ-পুণ্য অর্জনের জন্য, কেউ বা দেশভ্রমণের জন্য। যাঁর মধ্যে অধ্যাত্ম কৌতূহল, তিনি ভ্রমণের টিকিট হাতে নিয়ে বেরুলেও পথে তীর্থ পড়লেই নেমে পড়েন, পূজা দেন, কিংবদন্তীর স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। আবার তীর্থে গিয়েও কেউ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হাতছানীতে মুগ্ধ হন। দেবতা গৌণ হয়ে দেখা দেন, মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতি। বস্তুতঃ দেবতার মূর্তিতে যেমন অতীন্দ্রিয়তার ছাপ আছে, তেমনি প্রকৃতির গায়েও রয়েছে দেবতার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে। আকাশ যার দু'চোখে তৃপ্তি দেয়, তিনি দেবতারই আরাধনা করেন। ফুল, ফল, পাহাড় পর্বত, নদনদী, ঝর্ণা, সমুদ্র যাঁকে তৃপ্তি দেয় তিনিও দেবতারই প্রসাদ লাভ করেন। আমার কাছে অন্ততঃ দুইয়েরই মর্যাদা তুল্যমূল্য।

মহালয়ার পুণ্য লগ্নেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। প্রথম লক্ষ্য রাখলাম কাশী। উত্তর ভারতের যে কোন প্রান্তরই আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। সেখানে প্রকৃতির মধ্যে আমি যেন সুদূরলোকের ইশারা পাই। কলকাতা থেকে গঙ্গা পেরিয়ে শিল্পাঞ্চলের অভিশপ্ত ছায়া ছাড়াতে পারলেই মাটি আর প্রকৃতি কেমন যেন দৈব মাহাত্ম্যে ভরে উঠে। উত্তর রেলপথের দুই ধারের সর্বত্রই আমি এই ছোঁয়া পাই। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দুই ধারের শ্যামল ছবিতে উত্তর ভারতের গৈরিক উদাসীনতার তেমন স্পর্শ নেই। কিন্তু উত্তর ভারতের শুষ্ক মৃত্তিকা যেন দেবতার পায়ের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হয়ে আছে। রাত্রির অন্ধকারের স্নিগ্ধ কেশজাল পার হয়ে দিনের আলোতে চতুর্দিক দেখতে দেখতে

শেষপর্যন্ত হাজির হলাম কাশী। কাশীর কাছাকাছি আসতেই মনে পড়ে গেল সত্যেন দত্তের কবিতার লাইন কটি ঃ

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল, দেখা যায় বারাণসী।
চমকি চাহিনু, স্বর্গ সুষমা মর্ত্যে পড়েছে খসি।
এপারে সবুজ বজরার ক্ষেত ওপারে পুণ্য পূরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ ঝুরি।

সত্যেন দত্তের কবিতার বর্ণনার মত সবটা দেখলাম কিনা জানি না, তবে মনের মধ্যে কী একটা যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। সুন্দর অসুন্দর ভাল মন্দ, সব কিছুই অনেকটা মানুষের মনের নিজের সৃষ্টি। মনের মধ্যে কোথাও যদি কারো সম্পর্কে কোন বিরাগ ভাব থাকে তবে যত সুন্দরই তিনি হোন না কেন চোখে সৌদর্যের কোন প্রতিফলন ঘটে না। আবার মনের জটিলতার মধ্যে কোথাও যদি কোন দুর্বলতা থাকে তাহলে অসুন্দরও সুন্দর হয়ে উঠে। আমার চেতন মনে দেব-দেবীর প্রতি কোন ভক্তি নেই। তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসী সম্পর্কেও কোন শ্রদ্ধা নেই। তবু আমি দেখেছি যে, কোথাও বেরুলে তীর্থস্থানের পরিবেশ আমাকে প্রবলভাবে টানে, যদিও আমি জানি এখানকার পাণ্ডা পুরোহিতেরা প্রতারক, ঈশ্বর পূজারীর ছদ্মবেশ ধরে আছে, ঈশ্বর বানানটা পর্যন্ত শুদ্ধ করে জানে না। মূর্তির মধ্যে শক্তি আছে, একথা আর যিনিই বিশ্বাস করুন আমি করি না। তবু আমি নিজের মনে ভেবে অবাক হই যে, তীর্থস্থানে কিসের ছায়া দেখে আমার ভাল লাগে! অনেক সময় অনেক লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। হিসেব নিলে হয়তো দেখা যাবে যে, কোন স্মৃতির মুখের সঙ্গে সে মুখের সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু 'আমি', যে তথাকথিত লৌকিক ধর্মে বিশ্বাস করেনা, তার পক্ষে তীর্থস্থানের মোহে পড়া কী ভাবে সম্ভব? নিজের মনের মধ্যেই এর কোন জবাব খুঁজে পাইনা আমি। যতই জবাব খুঁজে পাইনা ততই, Pascal-এর সেই কথাটা আমার মনে পড়ে—'The heart has its reason of which reason

knows nothing.' ততই আমার ফ্রয়েডের subconscious mind এর কথা মনে পড়ে এবং ডঃ গ্রোডেকের 'The It' শব্দটির দিকে দৃষ্টি যায়, যে 'It' কে ডঃ গ্রোডেক গভীরতম মানসিক সত্তা বলে মনে করেন। সেই গভীরতম সত্তাই নাকি সচেতন সত্তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। তার ইচ্ছাতেই মানুষের রোগ হয়, তার ইচ্ছাতেই নিরাময়। আমার সেই গভীরতম মনের, আমার সেই গভীরতর সত্তার কোন হদিশ আমার জানা নেই। হয়তো তার ডাঙশের খোঁচা খেয়েই তীর্থস্থানের দিকে আমার দৃষ্টি ভিন্নতর। যদিও সচেতন বিচারে আমি এসবে বিশ্বাস করিনা তবুও একটা কোন মারাত্মক রহস্য তো মানুষের মধ্যে আছেই! আর সেই কারণেই কাশীকে প্রথম দর্শনেই আমার ভাল লাগল।

আমার দারুণ ঘৃণা, তবু কেন যেন রামকৃষ্ণ মিশনের কথাই মনে পড়ে গেল। শুনেছিলাম তীর্থস্থানের কাছাকাছিই নাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। সুতরাং রিক্সাওয়ালাকে বললাম, চলো রামকৃষ্ণ মিশন।

মনের মধ্যে যে মন থাকে, সে সব জানে, সে সব দেখতে পায়। আসলে সেই চালায়, আমরা চলি। আমাদের সচেতন মন ভাবে, করছি আমরা নিজেরাই। যখন কোন কাজের অর্থ ঠিক ধরতে পারিনা, যখন দুঃখবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ি তখনই শুধু ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সচেতন মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করি। আসলে দুঃখও আমাদেরই ইচ্ছা প্রসূত, সুখও তাই। বিপদও আমাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত, বিপদমুক্তিও। বোধহয় গভীরতম মনের নির্দেশেই আমি ভেবেছিলাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কথা। গভীরতম মনের নির্দেশে বলেছিলাম বটে, সচেতন মনে ছিল দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, পাব তো? সেখানে কোন আশ্রয় পাবতো?

রিক্সাওয়ালা মিশনের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েই চার্জ হাঁকল পাঁচ টাকা। প্রথমটা বুঝতে পারিনি যে সোজা পথে না এসে সে এসেছে বাঁকা পথে, নতুন যাত্রীদের সঙ্গে বাঁকা পথে চলবে বলে। যেখানে সময় লাগা উচিত দশ মিনিট, সেখানে সে সময় লাগিয়েছে বিশ মিনিট। টাকা তখন প্রশ্ন নয়, মিশনের দুয়ারে এসে যে পৌঁছুতে পেরেছি—এজন্যই ছিল আনন্দ। পাঁচ টাকা দিয়ে মিশনের অফিস ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মিশনাধ্যক্ষ বৃদ্ধ মহারাজ কেবল তখন অফিস ঘরের দিকে আসছেন। জানি না তিনি কে! অফিস ঘরে ওঠার আগেই নমস্কার করে সামনে দাঁড়ালাম। নমস্কারের ঢং দেখে নিশ্চয়ই তিনি বুঝেছিলেন যে, স্বার্থ আছে, ভক্তি আপ্লুত নমস্কার এটা নয়, কিন্তু তবু তাঁর মুখে বিরক্তির বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখলাম না। বললেন, কোথা থেকে আসছ বাবা?

বললাম, কলকাতা থেকে।

—উঠেছ কোথায়?

—কোথাও উঠিনি, এখানে উঠব বলেই এলাম।

—আগে চিঠি দিয়েছিলে ?

মাথা নিচু করে বললাম, আজ্ঞে না।

—চিঠি না দিলে তো এখানে ঘর পাওয়া মুস্কিল।

আমি যেন ভেঙে পড়লাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন, তিনিই জানেন। সরাসরি হাঁকিয়ে দিলেন না। বললেন, চল, দেখি অফিস ঘরে।

অফিস ঘরে গিয়ে বৃদ্ধ মহারাজ খবর নিলেন, কোন ঘর আছে কিনা। মহারাজরা জানালেন, না। শুনে পরিত্যক্ত একটা হতভাগ্য ব্যক্তি বলে মনে হল নিজেকে। বোধ হয় কারো উপর অভিমান হল। কার উপর জানিনা। ঘুরে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ মহারাজ ডাকলেন, একটু দাঁড়াও।

দাঁড়ালাম।

মিশনের ঠিক বিপরীত দিকেই রাস্তার উপর দুটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। মহারাজ অফিসে জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কোন ঘর আছে কিনা। অফিস জানাল, হ্যাঁ, আছে একটা।

মহারাজ বললেন, তাহলে ওকে ঐ ঘরটাই দাও।

আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি বললেন, ঘর ভাড়া দৈনিক এক টাকা। খাওয়া খরচা প্রতি বেলা এক টাকা। মিশনে এসে নির্দিষ্ট সময় খেতে হবে, পারবে তো ?

ভূ-ভারতে থাকা খাওয়ার এমন সস্তা ব্যবস্থা আছে, যিনি জগৎকে অন্ন দান করেন, স্বয়ং কাশীশ্বরী মা অন্নপূর্ণাও বোধহয় তা জানেন না। বললাম, আপনার করুণার কথা ভুলব না।

তিনি হেসে বললেন, মানুষ কেউ কাউকে করুণা করতে পারে না, করুণা তাঁর।

এই 'তাঁর' ব্যক্তিটি কে ? আমার মনে তাঁকে নিয়েই যত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়। জীবনে এর আগে সেই 'তাঁর'-এর কোন করুণা পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের অফিস ঘরে, বৃদ্ধ

মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে সেই 'তাঁর'-এর সম্পর্কে আমার নতুন ভাবনা হল। কেউ দুই নেত্র উর্ধ্বে তুলে 'তাঁর'-এর সন্ধান দেন সেখানে, যেন সুনীল উর্ধ্ব গগনটা স্বর্গ। সেখানেই সেই মহাশয় ব্যক্তিটি বসে থাকেন। কেউ সন্ধান দেন নিজের বুকের মধ্যিখানটা দেখিয়ে। আসলে যে তিনি কোথায় থাকেন কে জানে! তিনি যেখানেই থাকুন, থাকুন বা না থাকুন, সেই তাঁকেই ধন্যবাদ জানালাম।

মহারাজ বললেন, এখানে মাছ মাংস হয়না জান তো?

আমি বললাম, প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন ছিল তা পেয়েছি। হোটেলে ওঠার নামে বড় ভয় করছিল।

—কেন।

—জানিনা। কেন যেন কোথাও কোন হোটেলে উঠলে আমার মনে হয় আমি ভিন্ন কোন জায়গায় উঠেছি। এ আমার জন্য নয়, আমার জন্য নয়, আমার জন্য নয়। তাই পুরীতে একটি হোটেলে উঠেও আবার বেরিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম ধরমশালায়।

কি খানিকটা তাকিয়ে দেখলেন বৃদ্ধ মহারাজ আমার দিকে, তারপর বললেন, তোমার ভাল হোক। যাও। যে কয়দিন খুশি এখানে থাকতে পার।

মিশনের একজন দারোয়ান আমাকে পৌঁছে দিল রাস্তার উল্টোদিকে সেই নির্দিষ্ট ঘরে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর। পাশে বাথরুম। তেমনই পরিষ্কার। চব্বিশ ঘণ্টা জল। নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

দুপুরটা বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে বেরুলাম মন্দিরের দিকে। গ্রাম গঞ্জের চেয়ে শহরে রাহাজানি বেশি হয়। রাজার রাজা সম্রাটের শহরে পৌঁছুতে হলে যে রাহাজানির সম্ভাবনা আর একটু বেশি ভাবতে পারিনি। যে পুলিশের উপর শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা সেই পুলিশই লুণ্ঠন করে। সম্রাটের যারা রক্ষিবাহিনী সেই তারাই বা ছাড়বে কেন। পরম পাথেয় নেবার জন্য যে সম্রাটের কাছে যাবে, তাকে কিছু খেসারত-তো দিতেই হবে। সরকারী কণ্ট্রাক্ট পেতে হলে অফিসারকে কিছু

ছাড়তেই হবে। ব্রিজলাল পাণ্ডা বলে এক মহা পাণ্ডার হাতে পড়লাম, মন্দিরে ঢোকার মুখে। সে বেশ কিছু খরচা করিয়ে ছাড়ল শিবদর্শন করানোর নামে। পরমপুরুষ সেই শিব তো শুধু একা নন। সম্রাটের সভাষদেরাও আছেন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। প্রণামী রাখতে হল সর্বত্রই। অফিসার তো সরাসরি ঘুষ নেননা, নেন কেরানীর হাত দিয়ে। মনে হল সভাষদেরা সেই অফিসার। সম্রাটের দরবারে ঢুকে শেষ পর্যন্ত বড় রকমের একটা নজরাণা তো আছেই।

ধর্মের পথ সোজাও আছে, বাঁকাও আছে। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমন গোলক ধাঁধার মত পথ মন্দিরে ঢোকার ক্ষেত্রে যে, অনভিজ্ঞদের ভয়ই করবে। কিন্তু আর একটি পথ আছে সোজা, যে পথের সন্ধান মন্দিরে কিছুদিন ঘোরা ফেরা না করলে কেউ পায়না। অন্ততঃ একবার শিবদর্শন না হলে কেউ পায় না। যাঁরা শিবদর্শন করতে চান তর্কের পথে, তাঁদের জন্য ঘোরা পথ। যাঁরা শিবকে পেতে চান ভক্তির পথে, তাদের জন্য সোজা পথ। তর্কের পথে ঈশ্বরের আবাস গোলক ধাঁধায়। ভক্তির পথে উন্মুক্ত প্রান্তরে। বুঝলাম, আমার ভক্তি নেই, তাই চোখবাঁধা কলুর বলদের মত ঘুরতে হল বিশ্বনাথ দর্শনে এসে। গচ্চাও দিতে হল অনেক।

ছোট বেলা ছিলাম বিহারে। আমার জ্যেঠামণি ছিলেন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের প্রবল প্রতাপসম্পন্ন জমিদার শ্রীপৎ সিংয়ের নায়েব। একবার সেই রাজা শ্রীপৎ সিং আসবেন জমিদারী দেখতে। সেপাই সান্ত্রী লোকলস্করে সমগ্র কাছারী বাড়িতে তখন এলাহী কারবার। আমার বয়স তখন অল্প। রাজা দেখেছি ছবিতে, চর্ম চক্ষে দেখিনি কখনও। ভাবলাম মণি-মাণিক্য খচিত সে এক দেবোপম চিত্র হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু যখন এলেন, তখন দেখে তো অবাক। একেবারে সাধারণ একটা মানুষ। মাথায় টাক। বাবা বিশ্বনাথও যেন সেই শ্রীপৎ সিং মহারাজ। এত জাঁকজমকের ভেতরে রয়েছেন বটে, তিনি কিন্তু নিরাভরণ। আমরা যে রাজ রাজড়া দেখি তা পোষাকের

আড়ালে। রাজার আসল রূপ দেখতে পান শুধু তাঁর অন্তরঙ্গ নিকটজন। দূর থেকে যে বিশ্বনাথ সম্রাট, কাছে থেকে তিনিই নিরাভরণ। ফুল বেলপাতা আর দুধের জলে চৌবাচ্চার মধ্যে বাবা বিশ্বনাথকে দেখলাম নগ্নগাত্র। একটা গরু এসে গা চাটছে। বাইরে ঠাঁট করি না যতই, কোথায় যেন আমাদের একটা দুর্বলতা আছে এই সব দেবদেবীর দিকে। সেই অনাড়ম্বর বিশ্বনাথের গা ছুঁতেই কেমন যেন তৃপ্তি বোধ করলাম। বুঝি আর না বুঝি মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবলাম, স্বর্গের পাথেয় জোগাড় করে নিয়ে গেলাম এখান থেকেই। এতগুলো টাকা ঘুষ দেবার যন্ত্রণা আর মনে থাকল না। ধাঁধার পথে ঢুকেছিলাম বটে, বেরুবার সময় পাণ্ডা বের করে দিল সোজা পথে। পরম পুরুষের দেখা পাবার পর পথ বুঝি এমনিই সহজ হয়ে যায়। মনের আঁচলে পুণ্যের সঞ্চয় বাঁধতে বাঁধতে এসে বাইরে দাঁড়ালাম।

মন্দির থেকে বেরুলেই কয়েক গজ দূরে কাশীর ঘাট। ভিখারীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে এগুতে লাগলাম সেই দিকে। স্থানমাহাত্ম্য নিশ্চয়ই আছে। গঙ্গাকে তো কত জায়গা থেকেই দেখা যায়, কিন্তু তীর্থস্থানের পাশ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার রূপ যেন আলাদা। স্বর্গ থেকে কোন অমৃত নিয়ে সে যেন প্রবাহিত। সেখানে তার রূপে এক অপূর্ব প্রশান্তি। সিঁড়ি বাঁধানো গঙ্গার ঘাট, স্তরে স্তরে নেমে গেছে জলে। বহু লোক সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে আছে। গোল গোল কাঠের ছাতা। ক্রিয়াকালে পুরোহিতেরা সেখানে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। পুণ্যার্থীরা মুক্তির স্পর্শ পাবার জন্য গঙ্গার জল ছুঁয়ে মাথায় দিচ্ছেন। কেউ বা ঘাটে বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থেকে সেখান থেকে ভারত-আত্মার স্পর্শ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন। কোথাও বা কীর্তনীয়ারা গান করছে, তাদের ঘিরে ভিড় জমেছে। দক্ষিণা ছড়িয়ে দিয়ে কেউ পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করছেন। সাধু সন্ন্যাসীও আছেন, কেউ বসেছেন তাঁদের ঘিরে। আমার সমস্ত অন্তরাত্মার মধ্যে আমি যেন কেমন শিহরণ বোধ করতে লাগলাম। কেবলই মনে হতে লাগল, এ যেন আমার অত্যন্ত

পরিচিত দৃশ্য। কবে এখানে এ দৃশ্যের সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে, ছিলাম মনে করতে পারলাম না। শুধু মনে হতে লাগল, আছে আছে আছে, এখানে কিছু একটা আছে। কি আছে, বুঝতে পারলাম না।

আমি সিঁড়িতে সিঁড়িতে, প্রতিটি ধূলি কণাতে খুঁজে দেখতে লাগলাম সেই সব মহাসাধকের স্পর্শ, যাঁরা ভারতবর্ষকে প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত রেখেছেন আজ পর্যন্ত। কাশীর জীবন্ত শিব তৈলঙ্গস্বামী এখানেই তাঁর অলৌকিক লীলা দেখিয়েছেন। এখানেই স্বামী নিগমানন্দ থেকে কত মহাসাধক এই সিঁড়ির ধাপে বসে সাধনা করে গেছেন। আজও কত মহাসাধক হয়তো আসেন। কিন্তু আমাদের নকল চোখে তাঁদের হদিশ মেলে না। জহুরী ছাড়া রত্ন চেনা কঠিন। রঙিন কাঁচকে রত্ন বলে ভাবে সাধারণ মানুষ। সাধু সন্ন্যাসীর বেশে যাঁরা লোকের কাছ থেকে পয়সা কুড়িয়ে পায় তারাই হয়তো সেই নকল কাঁচ। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের সেখানে দেখে আমার সাধারণ বুদ্ধিতে আমি তাদের মূল্য যাচাই করতে লাগলাম। জানি না আমার সচেতন মন কিংবা গভীরতর মন কে যেন বলে উঠল—না, না, এঁরা কেউ সাধু নন। এঁরা কেউ সেই পরম সত্যের স্পর্শ পান নি। যাঁরা পরম সত্যের স্পর্শ পান তাঁরা নিজেকে জাহির করার কোন চেষ্টাই করেন না। যাঁরা গৈরিক বসন পরেন, রক্তাম্বর প'রে গায়ে ভস্ম মেখে মানুষের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ান—তাঁরা নিজেদের সাধুসন্ত বলে জাহির করতেই বেশী ব্যস্ত। প্লাস্টিকের ফুলকে ঘরের টেবিলে ফুলদানির ভিতর চোখের সামনে রাখতে হয়, সে যে ফুল এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু যে ফুল যথার্থ ফুল সে ফুল আত্মপরিচয় দেবার জন্য মানুষের চোখের সামনে আসবার প্রয়োজন বোধ করেনা। তার মধ্য থেকে যে গন্ধ উঠে সেই গন্ধই ফুলপিয়াসীকে ফুলের কাছে টেনে নিয়ে যায়। লোকালয়ে ঘুরে বেড়ানো সাধু যথার্থ নয় হয়তো। যদিও একটা কথা আছে যে, পোশাক পরিচ্ছদ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তবু কতটা পারে সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। জার্সি.

পরলেই ফুটবল প্লেয়ার হওয়া যায়না—যদি না ফুটবলের কলাকৌশল কষ্ট করে আয়ত্ত করা যায়। সামরিক পোষাক পরলেই কেউ জেনারেল হয়ে যায়না, যদি না সে বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়। সুতরাং সাধু বেশে দেখা গেলেই লোকে সাধু হয় না। অনেক সময় খুনীও আত্মগোপন করার জন্য সাধু সন্ন্যাসীর পোশাক পরে।

সাধু সন্ন্যাসীর ভেতর থেকে একটা গন্ধ বেরয়। তাঁর কপালে একটা জ্যোতি থাকে। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে পুণ্যপ্রয়াসী লোকের ভিড়ের মধ্যে যাঁদের আমি সাধু বেশে দেখতে পেলাম, তাঁদের কারো চোখে সেই ইস্পাতের দীপ্তি যেন আমার নজরে পড়ল না। সেইজন্য এঁদের সাধু বলে আমার মনে হল না। যদিও নিজের চোখের মূল্যটাও বিচার্য। (রঙিন চশমা পরা থাকলে সব কিছুর যথার্থ রঙও তো দেখা যায় না! আমাদের মনটাই আমাদের চশমা, তার যে রকম রঙ সেই রঙেই আমরা দেখি। চোর সব মনুষকেই সন্দেহ করে, সাধু সব মানুষকেই বিশ্বাস করে। নিজেকে না জানা পর্যন্ত অপরকে জানার সুযোগ কোথায়!) সেই জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বেদনা বোধ করতে লাগলাম। যে সত্যকে জানার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি তাকে জানবো কোথায়?

সন্ধ্যাবেলা মিশনের সেই ভাড়া করা ঘরে ফিরলাম। রাত আটটার মধ্যে খাওয়ার ব্যবস্থা। একা ঘরে মন বসছিল না। একটু আগেই গিয়ে উঠলাম মিশন প্রাঙ্গণে। তখনও আরতি হচ্ছে। বহু লোক সেই আরতি দেখছেন। মন্দির প্রাঙ্গণের দাওয়ায় দেখলাম একজন স্বামীজী বসে। বয়স হয়েছে। বহু লোককে দেখলাম তাঁর সঙ্গে আলোচনা করছেন। অধ্যাত্ম জীবনের জন্য নানা নির্দেশ নেবার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। স্বামীজী কিছু কিছু নির্দেশ দিচ্ছেনও। কথায় কথায় তিনিই জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি হলেন প্রবীনতম মহারাজ কাশী মিশনের। কোথায় যেন তাঁর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম আত্মম্ভরিতার ছাপ আছে। আমার হৃদয় তন্ত্রীতে তাঁর কথাগুলো

তেমন ঝঙ্কার তুলতে পারল না। ত্রুটি তাঁর কি আমার, কে বলতে পারে! উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কলাকৌশল না জানলে তার সুর তরঙ্গ সাধারণের হৃদয়ে তো সেই অতীন্দ্রিয়তার ছোঁয়া দেয়না! আত্মম্ভরিতায় আমরা সবাই ভুগি। তাই নিজের মানদণ্ডে অপরের বিচার করার চেষ্টা করি। ত্রুটি আমার, না এই প্রাচীন স্বামীজীর কে জানে!

আমি স্বামীজীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। অন্যেরা যেমন তাঁকে নানা প্রশ্ন ক'রে নানা বিষয়ে জানার চেষ্টা করছিল— আমি তেমন করছিলাম না। একবার তিনি নিজেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে তোমার?

বললাম, কলকাতা থেকে।

—মিশনেই উঠেছ?

—হ্যাঁ। মিশনের পাশে ঐ যে ভাড়া করা ঘর আছে, বুদ্ধু মহারাজ আমাকে সেখানেই একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

—কি করা হয় তোমার বাবা?

বললাম, অধ্যাপনা।

—বিষয় কি?

—ইতিহাস।

তিনি বললেন, ভাল, ভাল বিষয়। ইতিহাস মানুষকে সত্য জানতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন অংশটি তোমার ভাল লাগে?

বললাম, যে অংশটি ইতিহাস লেখার জন্য লেখা হয়নি সেই অংশটি।

অবাক হয়ে বৃদ্ধ স্বামীজীটি আমার দিকে তাকালেন, কি রকম?

বললাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস তার বাইরে নয়, ভেতরে। সুতরাং রাজনৈতিক ইতিহাস ঘেঁটে ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে না। ভারতাত্মার স্বরূপ যেখানে আছে, সেখানেই তার ইতিহাস। বেদ সংহিতা, উপনিষৎ, ষড়দর্শন—এরই মধ্যে রয়েছে ভারতবর্ষ।

স্বামীজী আমাকে খুব তারিফ করলেন, বললেন, চমৎকার। তারপর

জিজ্ঞাসা করলেন, বেদ সংহিতা ও উপনিষৎ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?

বললাম, বেদ সংহিতা সৎ কবিহৃদয়ের অনুরণন। উপনিষৎ বৈজ্ঞানিক হৃদয়ের জিজ্ঞাসা।

—বেদকে তাহলে তুমি কাব্য বলে মনে কর ? ধর্মগ্রন্থ মনে করনা ?

—মহৎ কাব্য ও মহৎ ধর্মগ্রন্থ এক।

—কি রকম ?

—পবিত্র হৃদয় থেকে দুইয়েরই জন্ম। দুইই সত্যের পরিচয় দেয়। এবং বিচার বিশ্লেষণহীন সৎ হৃদয়ের আবেগ তর্কের চেয়ে অনেক বেশী সত্যের নিকটে নিয়ে যেতে পারে।

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, একটি উদাহরণ দিয়ে আমাকে বোঝাতে পার ?

কিছুটা হক্‌চকিয়ে গেলাম। বেদ সংহিতা আমি পড়েছি, বিচার করেছি, কিন্তু স্মৃতিশক্তি আমার দুর্বল হওয়াতে তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যে বিশ্লেষণ করব তা পারলাম না। পুরুষ সূক্ত, নাসদীয় সূক্ত ইত্যাদির সারমর্ম আমার জানা আছে বটে, কিন্তু উদ্ধৃতি দিয়ে বলার ক্ষমতা নেই। কি করব ভাবছি, হঠাৎ একসময় রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা লাইন মনে পড়ে গেল। বললাম, ধরুন না, রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তিটিঃ 'এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে, যে শতদল পদ্ম রাজে, তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।'

স্বামীজী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, এই পংক্তিটিতে তুমি কি খুঁজে পেয়েছ বাবা, একটু ব্যাখ্যা করে বলবে ?

আমার সত্যি সত্যি গলদঘর্ম অবস্থা। হঠাৎ মনে এল তাই বললাম। এর যে যথার্থ ব্যাখ্যা কি, সত্যি আমি জানি না। অন্ধকারের মধ্যে যেন হাতড়াতে লাগলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ একটা পথ পেয়ে গেলাম যেন। বাবার কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় প্রায়ই তিনি আমাকে বলতেন, বাবা, একটু ধ্যান কর। ধ্যানে নাকি

কপালে ভ্রূ-যুগলের মধ্যে ছোট্ট একটা আলোর বিন্দু দেখা যায়। সেই বিন্দু ক্রমশঃ বড় হতে হতে এগিয়ে আসে, তারপর উজ্জ্বল নীল বর্ণের হয়। যেন অমৃত মাখানো কোন চাঁদের আলো। তারপর সেই আলো ক্রমশঃ ছড়াতে থাকে। প্রথম মুখের চারদিকে, তারপর দেহের চারদিকে, তারপর নাকি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই আলোতে ভরে যায়। সেই জ্যোতির্ময় আলো ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এই যে জ্যোতির্ময় আলো, এর যে কেন্দ্রবিন্দু, তাই বোধহয় শতদল পদ্ম। আমি সেই কথা স্বামীজীকে বললাম।

তিনি যেন আনন্দে উদ্ভাসিত উঠে বললেন, বাঃ! বাঃ! বাঃ! বাবা তুমি কখনও ধ্যান করেছ?

বললাম, না।

—তাহলে তোমার এ অভিজ্ঞতা হল কি করে?

—বাবার কাছে শুনে।

কি একটু তিনি তাকিয়ে দেখলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, আছে বাবা, তোমার মধ্যে জিনিষ আছে। একটু ধ্যান করবার চেষ্টা কর।

কিন্তু ধ্যানে বা ঈশ্বরে আমার নিজেরই খুব একটা প্রবৃত্তি আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং কিছু বললাম না।

স্বামীজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, কাশী এসেছ কেন? তীর্থ করতে?

ঠিক তীর্থ করতে কাশী এসেছি বা কয়েকটি তীর্থস্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি বললে ভুল হবে। আমি যথার্থ বেরিয়েছি সাধুসন্ত দেখতে, তাঁদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে কিনা তাই বিচার করতে। তাই বললাম, ঠিক তীর্থ করতে বেরুইনি, বেরিয়েছি সাধুসন্ত দেখতে।

হেসে স্বামীজী বললেন, পেলে?

বললাম, না, সে রকম মনে হল না। সত্যিই কি এ সব তীর্থে সাধু আছেন?

স্বামীজী বললেন, বাবা, সত্যকে জানতে বেরিয়েছ, খুঁজতে

বেরিয়েছ, খুঁজে দেখ। লেখাপড়া শিখলে কষ্ট করতে হয়, চাকুরী পেতে হলে কষ্ট করতে হয়, সংসার করতে হলে কষ্ট করতে হয়, সাধুসঙ্গ করতে হলেও তো বাবা সেটা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। জীবনে যা কিছু লোকে কামনা করে তা আপনা-আপনি কখনও আসে না, অর্জন করে নিতে হয়। সাধুর সাক্ষাৎ পেতে হলেও তাঁকে খুঁজতে হবে বাবা। তীর্থে তীর্থে খুঁজতে থাক।

বললাম, এই সব তীর্থের যথার্থ কোন মানে খুঁজে পাচ্ছি না আমি।

—কেন?

—প্রতিটি তীর্থ ঘিরে এমন সব গল্প যে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। এই ধরুন না কেন, শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের গল্পের কথাই বলছি।

স্বামীজী বললেন, এ-সব পুরাণের গল্প।

—পূরাণকে আমার জঘন্য মনে হয়।

—কেন?

—এমন বিকৃত গল্প বলেছে যে, অনেক সময় তা অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে। এর মধ্যে বিজ্ঞান সামান্য মাত্রও আছে বলে মনে হয় না।

হেসে স্বামীজী বললেন, বাবা, পুরাণ হল সাধারণ মানুষকে সৎপথে রাখার জন্য গল্প। গল্পের আড়ালেই এর দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে, সেটা খুঁজে বের করে নিতে হয়। মূর্তি আর ঈশ্বর যেমন, পুরাণ আর দার্শনিক সত্যও তেমনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম?

স্বামীজী বললেন, একসময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেশবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি এত ছোট কালীমূর্তি পূজো করেন কেন? যিনি বিশ্বময়ী তিনি এত ছোট কেন? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সূর্যটা কত বড়? কেশবচন্দ্র বলেছিলেন, পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বড়।

—তাহলে সূর্যটাকে এত ছোট দেখায় কেন?

—কারণ সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক দূরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, তুমিও ৺মা থেকে অনেক দূরে আছ বলে ৺মাকে আমার ছোট করে দেখছ।

কথা কয়টি বলে স্বামীজী আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, গল্পটার অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? আসলে মূর্তি ঈশ্বর নয়। মূর্তি একটা প্রতীক মাত্র।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে ৺কালীর কথা বললেন। এই ৺কালীমূর্তির প্রতীকী অর্থ কি?

স্বামীজী হেসে বললেন, বাবা, সেসব কথা পড়ে জানবে। তবে জেনে রাখ যে, সব মূর্তিরই প্রতীকী অর্থ আছে। ঘুরছো তো, ঘুরতে ঘুরতেই এ-সব একদিন জানতে পারবে। ঘুরতে ঘুরতে নিশ্চয়ই একদিন এমন সব লোকের সাক্ষাৎ পাবে যাঁরা তোমাকে এসব বলে দেবেন। সময় হলেই ঠিক জানতে পারবে। ধাপে ধাপে সব জানতে হয়, চিনতে হয়। ক্লাশ ওয়ানে পড়ে এম. এ. ক্লাশের অঙ্ক করতে চাইলে তো হবে না। এগিয়ে যেতে যেতেই সব হবে। জেনে রেখ মূর্তির মত পুরাণেও একটা অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। বাইরে থেকে দেখলে পুরাণকে বিকৃতরুচির গ্রন্থ বলেই মনে হবে। ভেতর থেকে দেখলে এর যথার্থ স্বরূপ জানতে পারবে।

আরও কি একটা কথা যেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঢং ঢং করে বেল বেজে উঠল। স্বামীজী বললেন, যাও বাবা, খাবার বেল পড়েছে। এখানে আবার সবই সময় মতো চলে। তবে কাশীতে যখন এসেছ তিন রাত্তির বাস কোরো! মণিকর্ণিকা ঘাটে যেও, সঙ্কট-মোচনে যেও, মানস মন্দিরে যেও। কাশীর কাছে আছে সারনাথ তাও দেখে এস। কে জানে, খুঁজতে খুঁজতে কোথায় তোমার প্রয়োজনীয় জিনিষ পেয়ে যাবে!

আমি স্বামীজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কিনা জানি না—পরদিন ঘুম ভেঙে উঠে রোদ ঝল্‌মল্‌ কাশীর দিকে যখন তাকালাম কেমন একটা আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় জগতের স্পর্শ যেন অনুভব করতে পারলাম। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা থেকে কী একটা সুপরিচিত সুর যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। শুধু মনে হতে লাগল, চিনি, চিনি, চিনি। কি চিনি নিজেকেই আমি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারলাম না। শুধু মনে হতে লাগল, এ যেন আমার অত্যন্ত আপনার জগৎ। যে গ্রামে আমার ছোটবেলা কেটেছে, সেই হারানো গ্রামে গেলে যেমন আনন্দের স্পর্শ পাই, ঠিক তেমনই আনন্দ বোধ করতে লাগলাম। অদ্ভুত নিকট আত্মীয় রোদ, মৃদু রোদ। আমাকে সে রোদ শুধু যেন বাইরে ডাকতে লাগল। যেন তপোবনের গন্ধ সেই রোদের মধ্যে। আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে এগুলাম।

মন্দিরের কাছ থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত ভিখারীর অরণ্য। পুণ্যার্থীদের দানের আশায় বুভুক্ষু কাকের মত বসে আছে ভিখারীরা। পুণ্যার্থীরা দান করছেন পুণ্যের আশায়, পাপ স্খালনের আশায়। ভিখারীরা দান গ্রহণ করছেন, পাপ গ্রহণ করছেন। তাদের ভাগ্যের কোন হের ফের নেই। ভিখারীর ভিড় কাটিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের সোপানে পা দিলাম। ডাইনে মা ৺কালীর ছোট মন্দির। বঙ্গরমণীরা সিক্তবস্ত্রে পয়সা রেখে সেখানে নমস্কার জানাচ্ছেন। আরো দূরে এগিয়ে নিচে নামলাম। ধাপে ধাপে দীর্ঘরেখা সোপান দাঁড়িয়ে। অসংখ্য পুণ্যার্থী ও স্নানার্থীদের ভিড়ে ভিড়াকার। কাঠের ছাতার নিচে পুরোহিতেরা বেদমন্ত্র পাঠ করছেন, সামগান করছেন। অনেকেই ক্রিয়া করছেন। মনে হল, কিছু ভেকধারী সন্ন্যাসী চোখবুজে বসে আছেন। স্বর্গের দূত এই সন্ন্যাসীদের করুণা পাবার জন্য অনেকে তাদের আশে-পাশে ঘুরঘুর করছেন। দু'একটা টাকা যে-সব পুণ্যার্থীরা দিচ্ছেন,

সে টাকা তাঁরা অচ্ছুৎ বলে দূরে সরিয়ে রাখছেন না। মানুষের চোখ নেই তাই দেখতে পায় না, পায়না বলে নকল মানুষের কাছে ছোটাছুটি করে। চোখ থাকলে বুঝতে পারত, যে অধ্যাত্মতার স্পর্শ প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে, সেই প্রকৃতিই মুক্তির দুয়ারের প্রধান তোরণ। অন্ততঃ রোদ্দুরে রঙিন গঙ্গা, সোঁদা গন্ধের জলস্রোত, ওপারে তটরেখার শেষ-প্রান্তে গ্রামের ছবি, উর্ধ্বে উদার আকাশ, কেউ যদি সমস্ত মনপ্রাণ খুলে দিয়ে এরই দিকে তাকিয়ে থাকে, বিশেষ করে তীর্থক্ষেত্রের উপর ঝরে পড়া প্রকৃতির দিকে, তাহলে সাধু সন্ন্যাসী যা না দিতে পারেন, তার চেয়ে অনেক বেশী জিনিষ তাঁরা পেতে পাবেন প্রকৃতির কাছ থেকে। মায়ের কোলে বসে থেকে মায়ের মূল্য কেউ বোঝে না। প্রকৃতিও আমাদের কাছে সেই রকম। আমি একমনে সেই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এই বিরাট দৃশ্যপট কত কথাই যেন বলছে! কান নেই তাই আমরা শুনতে পাই না, চোখ নেই তাই আমরা দেখতে পাই না।

এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার চোখে মুখে যেন শাণিত তরবারি। ইস্পাতের মত তা জ্বলছে। কেমন একটা যন্ত্রণা আছে, স্নিগ্ধতা নেই। তার ভাবখানা এই,—যেন সমগ্র জগৎটাকে বিদ্রূপের আঘাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত করে দিতে চান। যেন প্রচণ্ড অবজ্ঞা মেশানো বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটের সমগ্র পরিবেশটাকে তাকিয়ে দেখছিলেন। গঙ্গার পুণ্যপ্রবাহ ছোঁবার তাঁর ইচ্ছে নেই, মন্ত্রপাঠ করে পরলোকের পথ প্রশস্ত করার ইচ্ছেও নেই, সাধু সন্ন্যাসীর করুণার উপর নিজের ভার তুলে দেবার মানসিকতাও নেই। সবাই ব্যস্ত, স্নানে, পূজোয়। শুধু দুটি মাত্র প্রাণী—আমি আর সেই ভদ্রলোক, যারা শুধু দর্শক। ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি কাশীতে পুণ্য সঞ্চয়ে আসেন নি? তীর্থভ্রমণে আসেন নি?

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার এরকম প্রশ্নের কারণ?

—পুজো দিচ্ছেন না, স্নান করছেন না, সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছেন, তাই বললাম।

আমি বললাম, আপনিও তো আমারই মত দেখছি।

—হ্যাঁ, পুজো দিতে আমি আসিনি, পুণ্য সঞ্চয়েও আসিনি, এ-সব লোক ঠকানো রীতিতে আমি বিশ্বাসী নই।

—লোক ঠকানো বলছেন কেন?

—এর মধ্যে কিছু নেই। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানোর একটা উপায় মাত্র। কাশীর শিব দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—একখণ্ড পাথরকে আপনি ভগবান বলে ভাবতে পারেন?

বললাম, ওখানটায় আমারও একটু ধাঁধা আছে।

ভদ্রলোক বললেন, ধাঁধা কেন! জেনে রাখুন এ-সবই মিথ্যে। কাশীর বিশ্বনাথ একখণ্ড পাথর বই আর কিছুই নয়। সেই পাথরটিকে চোখের জলেও যদি আপনি ভাসিয়ে দেন, করুণা পাবেন না। অবজ্ঞা করে যদি থুথু ছিটিয়ে দেন, তাহলেও কোন ক্ষতি হবে না। মানুষ নিজের অস্তিত্বের নির্মম সত্যটাকে গ্রহণ করতে ভয় পায় বলে, এইসব অবান্তর কল্পনা করে সত্যের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করে। এই জীবনটার এখানেই উৎপত্তি, এখানেই লয়। এর আগেও কিছু নেই, পরেও নেই। এই নির্মম সত্যটাকে মানুষ গ্রহণ করতে ভয় পায় বলে, ঈশ্বরের চিন্তা করে, দেবদেবীর চিন্তা করে। বিশ্বনাথের যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে সুলতান মামুদের হাত থেকে সোমনাথ শিব নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন। সেই সোমনাথ-শিব গজনীতে সুলতান মামুদের 'বেহেস্তের হুরী' নামক মসজিদে মুয়াজ্জিনদের পা-ধোবার ধাপ হিসেবে ব্যবহৃত হত।

বললাম, এ-সব একটা প্রতীক মাত্র। প্রতীকের অন্তরালেই সত্য লুকিয়ে আছে।

ভদ্রলোকটি হো হো করে হেসে উঠলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন ?

তিনি বললেন, দুর্বলের ও দুর্জনের ছলের অভাব নেই। জানেন, এক জ্যোতিষী আমাকে একটা নীলা দিয়েছিলেন, প'রে কোন ফলই পাইনি, না ভাল, না মন্দ। তাঁকে গিয়ে একদিন বললাম, এ-সব অবান্তর জিনিষ অঙ্গে রেখে কি হবে ? আপনার পাথর আপনি ফিরিয়ে নিন। জ্যোতিষীর মুখ করুণ হয়ে উঠল। বললেন, নীলাটা না পরলে আরও খারাপ হতে পারত।' নীলাটা আমি তাঁর মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। যেমন তখনও ছিলাম, এখনও তেমনই আছি।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার মনে হয়···

—কি ?

—দার্শনিক কাণ্টের সেই কথাটাই এসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঈশ্বর না থাকলেও মানুষের প্রয়োজনেই তাঁকে তৈরি করে নিতে হয়।

ভদ্রলোক হেসে বললাম, আত্মপ্রবঞ্চনার এইই হল প্রকৃষ্ট উপায়। এতে কি হয় জানেন ?

—কি ?

— যা নেই তার জন্য ইহকালটাকেও আমরা উপভোগ করতে পারি না। এই পৃথিবীতে যতদিন আছেন ততদিন উপভোগ করে নেওয়াটাই বড় কথা। মরে গেলে আর কিছুই থাকে না। ধর্মের এই ভণ্ডামীর আসল রূপ কবি ওমর খৈয়াম ধরতে পেরেছিলেন বলেই লিখেছিলেন—'মূর্খ তোদের একুল ওকুল ডুবল ঘূর্ণিপাকে।' আপনি কি এসব অবান্তর আদিখ্যেতায় বিশ্বাস করেন ?

বললাম, করিনা হয়তো, কিন্তু আবার ভাবি, মানুষের সমাজের জন্য এ-সবের দরকার আছে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, সমাজ মানুষকে কি দিয়েছে বলতে পারেন ?

বললাম, শৃঙ্খলা ও সুখশান্তি দিয়েছে, নইলে তো অরণ্যের রাজত্ব চলত।

ভদ্রলোক বললেন, না, ওসব কিছু দেয়নি। অরণ্যের রাজত্ব ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নেই। অরণ্যের রাজত্বে নিয়ম হল 'জোব যার মুল্লুক তার', সমাজের রাজত্বে নিয়ম হোল, 'বুদ্ধি যার মুল্লুক তাব'। একজন গায়ের জোরে অপরজনকে বঞ্চিত কবে নিজে উপভোগ কবে, আর একজন বুদ্ধির জোরে অপরকে বঞ্চিত করে। ফলে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু উপায়ে। গভীরভাবে বিচার করে দেখলে দেখবেন, সামাজিক জীব হয়েও মানুষ অরণ্যের জীবের চাইতে সুখে নেই। এই সত্যটাকে Kant বিকৃত করতে চান। এইজন্য আমি Kant-এব ভক্ত নই, Hume-এর ভক্ত। Kant যেখানে বলেছেন—'God without certain Truth' Hume সেখানে বলেছেন 'Truth without God'.

বললাম, এতে কি শান্তি পাওয়া যাবে ?

—আত্মপ্রবঞ্চনা করেও কি লোকে শান্তি পাবে ?

—অন্তত: পোড়া ঘায়ে মলমের প্রলেপেব মত কাজ করবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আফিং খেয়ে লোকে দুঃখ বেদনা ভুলতে চায়, সেটাকে আপনি ভাল মনে কবেন ?

—না।

ভদ্রলোক বললেন, মলমটা একটা বাস্তব সত্য, আর এক বাস্তব যন্ত্রণার উপশম কবে। কিন্তু ঈশ্বব, দেবতা ইত্যাদি অবাস্তব। বাস্তব যন্ত্রণার এরা কোন উপশম করতে পারে না। বরং মানুষকে আরও প্রতারিত হতে সাহায্য করে। রাজারা একসময় ধর্মের 'নামে ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতার নীতিতে প্রজাপীড়ণ করতেন। পুরোহিতেরা ঈশ্বরেব নামেই প্রতারণা করেন। আদালতে ঈশ্বরের নামেই প্রহসন চলে। Karl Marx যথার্থই বলেছেন যে, Religion is opium of the People.'

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো এসব বিশ্বাস করেন না, বুঝলাম, তাহলে তীর্থে এসেছেন কেন ?

ভদ্রলোক বললেন, তীর্থে আসিনি, এসেছি কাশীতে।

—কাশী না এসে লক্ষ্ণৌও তো যেতে পারতেন?

ভদ্রলোক বললেন, মানুষের ভণ্ডামীর একটা সমীক্ষা করার জন্যই আমি এখানে এসেছি এবং আরও তীর্থ ঘুরেছি।

আমি বললাম, ঈশ্বর, দেবদেবী, ধর্ম, এসব সত্য না মিথ্যা জানিনা। না জেনে সত্যও বলবনা, মিথ্যেও বলবনা, সেই জন্যই আমি বেরিয়েছি। শত সহস্র বছর মানুষ কিসের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা জানবার জন্যই এসেছি। ঘুরব, যতটা পারব ঘুরব, বিচার করে দেখবার চেষ্টা করব।

ভদ্রলোক বিদ্রূপের হাসি হেসে আমার দিকে তাকালেন, দেখুন আমি দেখা প্রায় শেষ করে এনেছি।

আমি বললাম, দেখার কি শেষ আছে? যতদিন পরমায়ু ততদিন দেখা। চোখ বুঝলে দেখার শেষ, তার আগে নয়।

ভদ্রলোক বোধহয় আরও একটু তর্ক করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার তর্কে তেমন আগ্রহ ছিলনা। কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কথা শুনে। আমি নিজেও যে খুব একটা বিশ্বাসী লোক তা নয়। কিন্তু জোর দিয়ে তেমন অবিশ্বাসও করিনা। ঝাঁঝালো গলায় অনেক সময় প্রচলিত বিশ্বাসকে আঘাত করি বটে, কিন্তু অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে সেই আঘাতটাকেই যে চরম বলে মেনে নিই তা নয়। কোথায় একটা 'কিন্তু' আমার মধ্যে আছে। সেই রহস্যময় 'কিন্তু'র জন্যই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। ভদ্রলোকের বক্রোক্তিতেও সেই 'কিন্তু'টাকে আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছিলাম না। সেই রহস্যময় 'কিন্তু'টাই আমার কাছে যন্ত্রণাদায়ক। একে নির্দ্বিধায় ফেলেও দিতে পারিনা, গ্রহণ করতেও পারিনা। ভদ্রলোকের কথাগুলোকে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছিল না বলেই ভাল লাগছিলনা। তাঁর কথা-গুলোর মধ্যে যেন অকৃত্রিম বিশ্বাসের শক্তি নেই। যথার্থ ঘৃণা ভরে কেউ যদি 'শালা' বলে গাল দেয় তাহলে তা ক্রোধ উৎপাদন করে, আবার যথার্থ আদর করে কেউ যদি 'শালা' বলে তবে তাও ভেতরে

একটা নরম অনুরাগ তৈরি করে। ভদ্রলোকের কথাগুলো আমাকে তেমন ভাবে নাড়াতে পারেনি। পারেনি বলেই একটা অতৃপ্তির যন্ত্রণা ছিল। সেইজন্য ধীরে ধীরে আমি সরে এলাম, দশাশ্বমেধ ঘাট ছেড়ে মণিকর্ণিকা ঘাটের দিকে এগুলাম।

মণিকর্ণিকা ঘাট হল মহাশ্মশান। দিবারাত্র সেখানে চিতা বহ্নিমান। লোকের বিশ্বাস, কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে যদি শবদাহ হয় তাহলে চির মুক্তি। সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়। এই সহজ পুণ্যের আশায় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই প্রায় কাশীতে একটি করে গৃহ নির্মাণ করেছেন। ভারতের প্রত্যেকটি রাজা মহারাজারই কাশীতে একটি করে প্রাসাদ আছে। আগে বাংলাদেশের জমিদাররাও প্রত্যেকেই কাশীতে একটি করে গৃহ নির্মাণ করতেন। সারা জীবন পাপ করে শেষ জীবনে তাঁরা এসে কাশীবাস করতেন সহজপুণ্যের আশায়। বিনা সাধনায় মোক্ষের আশায়। জানিনা এ বিশ্বাসের ভিত্ কোথায়! জানিনা এধরনের বিশ্বাসের কোন যথার্থ অর্থ আছে কিনা। কামনা-বাসনা সংস্কারের হাত থেকে অত সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় কিনা। এ বিশ্বাসের ফলে কার কি লাভ হয়েছে জানিনা, এতে কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরের আয় বেড়েছে, পাণ্ডাদের স্থায়ী অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। শ্মশানের ডোমদের চিরকালের জন্য কাজ জুটে গেছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে ভারতের অধ্যাত্ম আত্মার একটা স্পর্শ আছে। মণিকর্ণিকা ঘাটে আছে ভয়াবহ চিতাগ্নি। আছে চির সত্যের প্রতি একটা ইঙ্গিত। এ নরদেহ সত্য নয় চিরকাল মণিকর্ণিকা ঘাট একথা নির্মম ভাবে মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই নির্মম সত্যের বাণী কাশীবাসীর ক'জনে ধরতে পারেন জানিনা। জীবনে একবার দু'বার যাঁরা শ্মশানে যান শ্মশানের নির্মমতা তাদের মধ্যে একটা বৈরাগ্য আনে—যাকে বলে শ্মশানবৈরাগ্য। শ্মশানের মাঝখানেই যারা বাস করে শ্মশান তাদের কাছে একটা সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর কথা তারা হয়তো আর ভাবেই না, যেমন সূর্যের

নিচে দাঁড়িয়ে সূর্যের কথা আমরা কখনও চিন্তা করি না। সূর্য যেমন আমাদের কাছে সহজ, মৃত্যুর মধ্যে যারা বাস করে মৃত্যুও তাদেরই কাছে তেমন সহজ। দিনরাত মড়া পুড়িয়েও পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি আকর্ষণে ঘুরে বেড়ায়। কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি বিপুর অত্যন্ত সহজ শিকার হয়। মণিকর্ণিকা ঘাটে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুব কথা এখানকার লোকে ভুলে গেছে। মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি। আর শোক প্রকাশ করে না অন্ধ তামসিকতায় যারা আচ্ছন্ন, তারা। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর বিয়োগ বেদনা অনুভব করে, কাঁদে। কাশীর ডোমদের দেখলাম মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসছে, অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করছে, মড়ার উপর খাড়াৎ ঘা দেবার জন্য দর কষাকষি করছে। মৃত্যু অমৃতজগতের কোন হাতছানী দিয়েছে বলে মনে হয়না। সে কি এই জন্য যে, 'ভাবার প্রয়োজন নেই' এই চিন্তা করে? মৃত্যু এখানে মোক্ষের দুয়ার খুলে দেয় এই কথা চিন্তা করে? ভাবতে লাগলাম, প্রচলিত বিশ্বাস কি তাহলে মানুষেব আত্মাব বন্ধন মুক্তির পথে বড় একটা অন্তরায় সৃষ্টি করেনি? আত্মজ্ঞান ছাড়া শুধুমাত্র চিতার আগুনে দাহ হলেই মুক্তি হতে পারে এধরনের উদ্ভট জ্ঞানের উৎস কোথায়, কে জানে।

আমি কিছুকাল অনির্বাণ চিতাগ্নি দেখলাম। চিতাগ্নির নিচে ডোমদের পার্থিব সত্তা দেখলাম। শ্মশান তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দাহ করতে যারা এসেছে তাদের মধ্যেও মৃতের নিকট-আত্মীয় ছাড়া আর কারো কোন ভাবান্তর নেই। সমগ্র মানবসমাজ যেন H. G. Wells-এর 'Time Machine' এর মানুষের মত হয়ে যাচ্ছে। দু'দিন পরে হয়তো আত্মীয়-স্বজনেরাও মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করবেনা। দার্শনিক মানুষ যারা, তাঁরা বীতরাগ ভয়-ক্রোধশোক হন। মানুষের আপন অন্তরে ডুব দেবার সময় নেই। অস্থিরচিত্ত মানুষ দিশেহারা, কিছুই ভাবতে পারেনা আজ। তার মধ্যে

শোকের অভাব হৃদয়াবেগের অভাব হেতুই হয়েছে। ঘোরতর তামসিকতায় আচ্ছন্ন হলে মানুষের মধ্যে বোধশক্তি লোপ পায়।

আশা করেছিলাম, মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে যথার্থ কোন সাধুর সাক্ষাৎ পাব। এই মহাশ্মশানেই তো মহাশাক্তপীঠ গড়ে উঠেছে। এই শাক্তপীঠ সতীর অঙ্গাভরণ থেকে তৈরি। সেইজন্য বলা হয়েছে:

'বারাণস্যা বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ'।

মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডল চ মম শ্রুতে।

অর্থাৎ বারাণসীতে পড়েছে সতীর কর্ণকুণ্ডল। দেবীর নাম বিশালাক্ষী, ভৈরবের নাম 'কাল'। গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটই সেই পীঠস্থান। অবশ্য মণিকর্ণিকার উৎপত্তি নিয়ে পুরাণে ভিন্ন রকমের গল্পও আছে। একসময় নাকি ভগবান বিষ্ণু চক্র দিয়ে কাশীধামে একটি পুষ্করিণী তৈরি করেন। নিজের দেহ নির্গত স্বেদ দিয়ে সেই পুষ্করিণী পূর্ণ করে তার পাশে বসে সহস্র বছর শিবের ধ্যান করেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে হরপার্বতী এসে দেখা দেন। হঠাৎ তখন পার্বতীর কর্ণভূষণ খুলে পড়ে সেই জলে। তখন থেকে এর নাম হয় মণিকর্ণিকা। সেই মণিকর্ণিকা পুষ্করিণীই এখন মণিকর্ণিকা ঘাট। কারো মতে এই মণিকর্ণিকা ঘাট একান্ন পীঠের একটি পীঠ, কারো মতে কাশীর অন্নপূর্ণাই শাক্তদেবী এবং তাঁর মন্দিরই একান্নপীঠের একটি পীঠ। সে যাই হোক, পীঠ মণিকর্ণিকাতেই হোক আর অন্নপূর্ণা মন্দিরেই হোক, অধ্যাত্ম সাধনার একটি বড় স্থান যে এই মণিকর্ণিকা ঘাট সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। অধ্যাত্ম সাধনার একটি বড় ক্ষেত্র হল শ্মশান, কারণ শ্মশান অত্যন্ত সহজে বুঝিয়ে দেয় যে, এই নশ্বর দেহ চিরস্থায়ী নয়, সত্য রয়েছে অন্যত্র। আমি কোন বিরাট ধরনের সাধুসন্তের এখানে সাক্ষাৎ পাব, মনে এই আশা নিয়েই এসেছিলাম, কিন্তু গঙ্গার ধারে গেরুয়া পরা, রক্তাম্বর পরা, ভস্মগাত্র, দাড়িগুম্ফ রুদ্রাক্ষত্রিশূল শোভিত অনেক সাধু সন্ন্যাসীর দেখা পেলেও মণিকর্ণিকা ঘাটে তাঁদের টিকিটিও দেখা গেল না। পুণ্য অর্জনের জন্য শ্মশানে এসে লোকে দাঁড়ায় না। শ্মশানকে লোকে সাধারণতঃ এড়িয়েই চলে।

সুতরাং পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে শ্মশানে কিছু পাবার নেই জেনেই বোধহয় সাধুসন্তরা এখানে নেই।

দেখলাম শুধু একটা ভিখারী গোছের লোককে, একেবারে উলঙ্গ, পাগল-টাগল হবে বোধহয়। এক চিতা থেকে আরেক চিতায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে আপন মনেই হাসছে। ডাস্টবিনে খাবার খুঁজে বেড়ানো মানুষের মতই অনেকটা দেখতে। লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে একবার সজোরে হেসে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমার গা'টা একটু ঘিনঘিন করে উঠল। ভাবলাম সরে যাব, কিন্তু সরতে পারলাম না। লোকটা প্রায় আমার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর স্পষ্ট বাংলায় আমাকে প্রশ্ন করল, এখানে কী দেখতে এসেছিস, এঁ্যা ?

লোকটির চিন্তাধারা সুশৃঙ্খল আছে কিনা ভাবছি, এমন সময় আপন মনেই সে বিড় বিড় করে বলে উঠল ঃ আসল পাগল যে, লোকে তাকে চেনে না।

ভারি কৌতূহল হল, আশ্চর্য তো! আমি মনে মনে যা ভাবছি লোকটা কি করে তা বুঝতে পেরেছে ? এবার কথা বলতে ইচ্ছে হল, বললাম,—আসল পাগল কে ?

—যে পাগল নয় সেইই আসল পাগল।

সে আবার কেমনতর কথা! আমি আবার নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। লোকটা বোধহয় যথার্থই পাগল। এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু লোকটি আমাকে অব্যাহতি দিল না। বলল, কিরে! আমার কথা বুঝতে পারিসনি না ?

—না।

—এই যে তুই নিজেকে সুস্থ বলে চিন্তা করিস,—তুইই কি যথার্থ সুস্থ ?

বললাম, আমি অসুস্থ হতে যাব কেন ?

লোকটি বলল, অসুস্থ মনের নির্দেশে যে কাজ করে সে অসুস্থ নয় রে ?

বললাম, তা হতে পারে, কিন্তু আমার মন অসুস্থ হতে যাবে কেন ?

লোকটি বলল, তোরা সব একালের লোক, তোদের নানা বিদ্যা-বুদ্ধি। তোদের পশ্চিমী বিজ্ঞান দিয়েই বল না—

আশ্চর্য! কথার ঢং দেখে আমি চমকে গেলাম, এযে রীতিমত শিক্ষিত মনে হচ্ছে! জিজ্ঞাসা করলাম, বলুন, কি বলতে চান ?

লোকটি প্রশ্ন করল, মনের কয়টি স্তর আছে বল্ ?

—ফ্রয়েডের মতে তিনটি।

—যথার্থ খাঁটি মন কোন্‌টি ?

—বোধহয় অচেতন মন।

—সে মনের খবর রাখিস ?

—না।

—কোন্ মনের নির্দেশে চলিস ?

—চেতন মনের।

—চেতন মন তো যথার্থ ইচ্ছাতে কাজ করেনা। সমাজের ছাক্‌নী দিয়ে ছেকে নিয়ে যে ইচ্ছাটুকু বাকী থাকে সেই ইচ্ছার বশে চলে। সামাজিক মনটাই তো মেকি মন রে। সুতরাং সেই মেকী মন নিয়ে যে কাজ করে সে পাগল না হয়ে কিছুটা খাঁটি মন নিয়ে যে কাজ করে তাকেই তোরা পাগল বলিস ?

কথাটার তাৎপর্য নিজের মনের মধ্যে বিচার করে দেখলাম। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে, পাগল কাজ করে অবচেতন মনে অবদমিত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়। অবচেতন মনও যথার্থ মন নয়। তার নিচে রয়েছে আসল মন, যা আমাদের কাছে অচেতন। সেইজন্যই বোধহয় লোকটি 'কিছুটা খাঁটি মন' শব্দটি ব্যবহার করেছে। অবচেতন মন চেতন মনের চেয়ে কিছুটা খাঁটি সন্দেহ নেই। আমি অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

লোকটি জিজ্ঞাসা করল, অহংকার হয় কোন্ বিদ্যায় জানিস্?

কিছুই বলতে পারলাম না, চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

তিনি বললেন, অহংকার হয় অবিদ্যা থেকে। তোর অহংকার আছে?

আমার বুকের ভেতর তখন যেন কিছু কিছু কাঁপতে আরম্ভ করেছে, বললাম, তা নিশ্চয়ই আছে।

— সেই অহংকারের বশে দেবতা-টেবতা কিছু মানিস না, তাই না?

চুপ করে থাকলাম।

লোকটি বলল, ঠিক করেছিস, ভালই করেছিস, দেবতা-টেবতা কিছু নেই, কিন্তু দেবতার অর্থ আছে।

—কি রকম? আমি যেন ক্রমশঃ বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলাম।

—এই ধর না শিব। শিবলিঙ্গ দেখে তো নাক সিট্‌কেছিস। লিঙ্গ শব্দের অর্থ জানিস।

বললাম, সাধারণতঃ লোকে লিঙ্গ বলতে যা বোঝে তাই বুঝি।

লোকটি বলল, পার্থিব লোক, পার্থিব অর্থেই বুঝিস। লিঙ্গের আসল অর্থ হল সূক্ষ্ম। লিঙ্গ হল প্রজনন শক্তির প্রতীক যা থেকে বীজ তৈরি হয়। বীজ থেকে সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির স্থূল কারণ আমরা জানি, কিন্তু সূক্ষ্ম কারণ আমরা জানিনা। শিবলিঙ্গ হল সূক্ষ্ম কারণের প্রতীক।

লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম, একটু স্পষ্ট করে যদি বুঝিয়ে দেন ভাল হয়।

লোকটি আমার কাছে একটি সিগারেট চাইল, একটা নেশার ডাণ্ডি দিতে পারিস বাবা? তোর সঙ্গে একটু মৌজ করে বসে গল্প করি।

পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে দিলাম, লোকটি সেই সিগারেট হাতে নিয়ে একটি চিতার কাছে এগিয়ে গেল। একটা জ্বলন্ত চেলাকাঠ টুঁকরে বের করে তাতে সিগারেট ধরিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে এল—'তাহলে শিব কয় রকম, তাই আগে জানতে হয়।'

বললাম, শিবের আবার রকমফের আছে নাকি ?

লোকটি বলল, আছে না। শিব হল তিন রকম।

—তিন রকম শিব !

—হ্যাঁ।

—তিন রকম কি প্রকার বলুন তো !

—এক হল কৃষ্ণ শিব।

—কৃষ্ণশিব আবার আছে নাকি !

—নেই ! তন্ত্রসার গ্রন্থ পড়িসনি ? সেখানে কৃষ্ণ শিবের উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র আছে ঃ

'মহাকালং যজেদ্দেব্যাদক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম।
বিভ্রতং দণ্ড খট্টাঙ্গো দংস্ট্রা ভীমমুখং শিশুম॥'

—এ শিবের অর্থ কি ?

—তিনি হলেন আদি। বিশ্বজগতের মূল কেন্দ্র। ধারণার অতীত বলে তিনি বর্ণহীন কৃষ্ণ। তিনি তন্ত্রের নিষ্কল, অর্থাৎ যার মধ্যে প্রকাশের ইচ্ছা জাগেনি। এই পর্যায়ের পুরুষই হলেন কৃষ্ণশিব। উপনিষদের তুরীয়াতীত পর্যায়ের।

—তাহলে শ্বেত শিব ?

—শ্বেতবর্ণ হল চৈতন্যের প্রতীক, জ্ঞানের প্রতীক। পুরুষের মধ্যে যখন আত্মজ্ঞান জাগরিত হয়েছে, তখনই তিনি শ্বেতশিব হয়েছেন।

—আর শিবলিঙ্গ ?

—আত্মজ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের মধ্যে যখন ইচ্ছাশক্তি জেগেছে, সেই পর্যায়ের শিব হলেন শিবলিঙ্গ। পুরুষের ইচ্ছাই হল তাঁর শক্তি। শক্তি হল পুরুষের প্রকৃতি। প্রকৃতি হল নারী। সেই নারীর প্রতীক যোনি, তাই শিবলিঙ্গ কখনও একক নয়, যোনির সঙ্গে যুক্ত। এ হল পুরুষের এমন এক পর্যায় যেখানে ইচ্ছা একাত্মভাবে তাঁকে জড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছা অবিদ্যা হয়ে প্রকাশিত হয়নি। সৃষ্টির অস্ফুট স্ফুরণের মুহূর্ত এটি। তারপর শক্তিতরঙ্গ নয়টি পর্যায়ে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূল

উপাদান সৃষ্টি করেছে। এই নয়টি তরঙ্গ হল তারা, ষোড়শী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, ছিন্নমস্তা, কমলা, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী ও বগলা। শূন্যরূপ পুরুষের মধ্যে অস্ফুট যে শক্তি, যে শক্তি প্রথম স্থিতির মধ্যে গতির আবেগ, তাই হলেন মহামায়া। মহামায়া হলেন কাল বা সময়ের প্রথম স্ফুরণ। সেই অব্যক্ত রহস্যময় কালের অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে তিনি ৺কালী। তিনি অব্যক্ত বলে অন্ধকারাচ্ছন্ন, অর্থাৎ যাকে জানা যায়না। তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। সেই কৃষ্ণবর্ণা মহাকালী-শক্তি থেকে দেশের সৃষ্টি। দেশ, তোরা যাকে Space বললে ভাল বুঝিস। সেই দেশের শক্তি হলেন তারা, নীলবর্ণা। হঠাৎ এইটুকু বলেই লোকটি আমার মুখের দিকে তাকাল, জিজ্ঞাসা করল, তুই ধ্যান করিস?

—কার ধ্যান?

—ভ্রূ মধ্যে বিন্দু ধ্যান?

—না।

—করবি, জানিস, ভাল লাগবে।

—করলে কি হবে?

—এই যে আমি কথাগুলি আজ বলছি, এর অর্থ বুঝতে পারবি। 'তারা' কি বুঝতে পারবি। চোখ বুজলে ভ্রূ মধ্যে প্রথম দেখা যায় অন্ধকার, অব্যক্ত রহস্যময় অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে ফুটে উঠে একটি বিন্দু। সেই বিন্দু স্ফুরিত হয়ে ধারণ করে নীলবর্ণ। ৺কালী থেকে ৺তারার এইভাবে উৎপত্তি। তারপর দেখবি রঙের খেলা। এই রঙের ঢেউয়ের মধ্যে আছে আটটি, মূল তরঙ্গ, যাঁরা ৺কালী ও ৺তারা এই দুই মহাবিদ্যার পরে অন্যান্য বিদ্যা নামে পরিচিত। ৺তারা থেকে বগলা পর্যন্ত সংখ্যা হল নয়। আদি প্রকৃতিবীজ মহামায়া মহাকালী পুরুষের সঙ্গেই যুক্ত থাকেন। এই নয়টি মৌল [illegible] সৃষ্টির যে পটভূমি তৈরি করে তার উপরই দেশের পাশে মহামায়া নিজে দাঁড়িয়ে অসংখ্য সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করেন। সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেই এটা জানতে পারবি।

অদ্ভুত রহস্যময় সাংকেতিক কথা যেন, বুঝি বুঝি করেও ঠিক বোঝা যায়না। অথচ এক দুর্নিবার আকর্ষণে জানবার কৌতূহল সৃষ্টি করে। সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে শক্তিতত্ত্বের সম্পর্ক কি, জানার জন্য সমগ্র মনোপ্রাণ মেলে লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

লোকটি বলল, দ্যাখ, মৌল সংখ্যা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ৺তারা থেকে বগলা। এদের সমন্বয়েই সমগ্র সংখ্যা, গণনাতীত সংখ্যা। দেশের বুকে যখন সময়ের খেলা ধরা পড়ে, তখনই মৌল সংখ্যার ঊর্ধ্বে নতুন সংখ্যা, যেমন, ১০। ১ হল ৺তারা। তাঁর পিঠে শূন্যরূপা মহামায়া ৺কালী দাঁড়িয়ে দেশকাল মিলে প্রথম করেন বস্তুজগতের সৃষ্টি। তারপর এই নয়টি শক্তি ও শূন্যরূপা মহামায়ার মিলনে অসংখ্য সংখ্যা অর্থাৎ সৃষ্টি। যেমন ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ইত্যাদি। দশ মহাবিদ্যাতত্ত্বের এই হল মূল রহস্য।

আশ্চর্য! আমি যেন চমকে গেলাম। এমনভাবে এসব তত্ত্বের কথা জীবনে আমি কখনও বিচার করে দেখিনি। আমি ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাসের আলোতেই এ যাবৎকাল সবকিছু বিচার করে দেখেছি। এতদিন আমার ধারণা ছিল, দশমহাবিদ্যা ভারতীয় দশটি উপজাতি কর্তৃক পূজিতা দশটি দেবীর একত্র সমাবেশ থেকে সৃষ্টি। ভারতবর্ষ চিরকাল একীকরণের যে প্রয়াস চালিয়েছে এ তারই ফল। দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, একান্ন শাক্তপীঠ, সব কিছুকেই এতদিন আমি এই আলোতেই দেখেছি। আমার সমগ্র চিন্তার ধারাটাই যেন ঘুরে যাবার উপক্রম হল। এতদিন আত্মঅহংকারে ভারতবর্ষের দেবদেবী, পুরাণ, সব নিয়ে যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছি, সবই যেন মহা অজ্ঞানতাপ্রসূত। নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। গান্ধীজীর বাঁদরই বোধহয় এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, যে খারাপ কথা কানে শোনেনা, খারাপ দৃশ্য দেখেনা, খারাপ বাক্য বলেনা। নতুন এক শিক্ষা পেলাম যেন।

লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেঃ হেঃ করে খানিকটা হাসল। তারপর বলল, কিরে! কি ভাবছিস?

লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

—কি বুঝলি কথা বলে ?

—তিনি তো এ-সব···

—কিছুতেই বিশ্বাস করে না, এই তো ? সব কিছুকেই বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেয় ?

—বোধহয়।

—(আসলে ওইই সব কিছুতে বেশী বিশ্বাস করে। আসলে কি জানিস, চাই চাই বললে কিছু পাওয়া যায়না। সেইজন্য ও কিছু পায়নি। একবার যদি চাইনা বলে অভিমান করে বসতে পারে তাহলে অনেক কিছুই পাবে। দেখিস না যে-ছেলে কেবল মায়ের কাছে চাই চাই বলে, মা তাকে দেন না। তারপর যখন চোখে জল নিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে 'কিচ্ছু চাইনা' তখন মায়ের বুকে বড় বাজে। মা দেবার জন্য এগিয়ে আসেন)

রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা লাইন মনে পড়ল :

('যখন ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা হাতের নাগালে
পেয়েছি সবারে নিচুতে।')

লোকটি আমাকে বলল, দে, আর একটা সিগারেট দে। এ্যাঁ, এতগুলো কথা বললাম, কি বলিস ?

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আচ্ছা, আমরা যারা এইসব দেব-দেবীর অর্থ না জেনে তাঁদের পুজো করি, তারা কোন ফল পাবনা ?

লোকটি সিগারেটে বিরাট একটি টান দিযে বলল, কেন পাবি না, কাজ করলে তার ফল নেই ! শিশু যদি ভুল করে আগুনে হাত দেয়, ফল পাবে না ?

বললাম, হ্যাঁ, হাত পুড়ে যাবে !

—তবে ?

একটু চিন্তা করে বললাম, অর্থাৎ শিশুর আগুনে হাত দেবার

মত, না জেনে দেবদেবীর পুজো করলে উল্টো যন্ত্রণাই ভোগ করতে হবে ?' অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, দেবদেবীর অর্থ না জেনে পুজো করলে যন্ত্রণাই সার ?

—যন্ত্রণা ! কেন ?

—কিছুই পাওয়া যাবে না। ব্যর্থতার যন্ত্রণা, ভুল করে মূল্যবান সময় নষ্ট করার যন্ত্রণা !

—তা হবে কেন ! মূর্তি কি আগুন, যে পোড়াবে ?

—কিন্তু কিছু তো দেবে না।

—দিতেও পারে।

—কি ভাবে দেবে ? মূর্তি তো আর সত্য নয়, মূর্তির ভাবটাই হল সত্য।

—এটা হল জ্ঞানীর কাছে, ভক্তের কাছে নয়।

—সত্যের আবার রকমফের আছে নাকি ?

—হ্যাঁ, যখন ইহলোকে বাস করিস, তখন সত্যের রকম ফের আছে।

—কি রকম ?

—সত্যকে কেউ জানেনা। জানিস তো, সত্য হতে হয়। যতক্ষণ কোন লোক বলে জানি, ততক্ষণ সে আংশিক সত্যকে জানে, ততক্ষণ সে নিজেও আংশিক সত্য। যখন যথার্থ সত্যকে জানে, তখন সে নিজেই সত্য হয়ে যায়, তখন আর সে জানে না। এই যে আমাকে তুই দেখছিস সামনে থেকে, সত্য দেখছিস না মিথ্যা দেখছিস ?

—সত্য দেখছি।

—আমি ঠিক যেরকম, সবটা সেরকমই দেখছিস ?

—তাই তো দেখছি।

—না।

—কেন ?

—তুই আমার সামনেটা দেখছিস, পেছনটা দেখতে পাচ্ছিস ?

—না।

—তাহলে আমার সবটা দেখছিস কি করে?

—তা বটে।

—কিন্তু আমার যতটা দেখছিস, ততটাও মিথ্যে নয় ততটা হল আংশিক সত্য। যখন আমার পায়ের নিচ, ব্রহ্মরন্ধ্র, পেছন দিক, দুই পাশ, সব একবারে দেখবি, তখনই আমার পরিপূর্ণ সত্যটাকে দেখবি। তখন কিরকম দেখবি, বল তো?

—এ তো, চতুঃমাত্রিক দৃশ্য, এ কখনও সম্ভবই নয়।

—অসম্ভবও নয়। যখন দেখবি, তখন কি দেখবি, জানিস?

—কি?

—তখন কিছুই দেখবি না। এই 'কিছুই না দেখা' হল সত্য হওয়া।

— অর্থাৎ সত্য হল 'কিছুই না', অর্থাৎ শূন্য?

—অর্থাৎ পূর্ণ

—শূন্যকে এই জন্যই পূর্ণ বলে'

—হ্যাঁ।

—তাহলে মূর্তি দেখা, আমাদের আংশিক সত্য দেখা?

—হ্যাঁ।

—এর কোন ফল আছে?

—হ্যাঁ।

—কি রকম ফল?

—যে রকম ফল চাস

—যদি চাই পূর্ণ সত্য?

—ধর আফ্রিকার জঙ্গলে এমন কোন ফল হয়, যা চোখে দেখিসনি, নামও শুনিসনি! চাইতে পারবি সেই ফল?

চুপ করে থাকলাম।

লোকটি বলল, যে লোকটা সত্য হল না, সে সত্য চাইবে কি করে? যতটুকু সে জানে, ততটুকু সে পাবে।

—মাটির মূর্তির কাছে ? পাথরের মূর্তির কাছে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু সেটা কি ভাবে সম্ভব ?

—শোন, কোন জিনিষই বাইরে সত্য নয়, যতক্ষণ না তা ভেতরে সত্য হয়ে ওঠে। বিশ্বাসে মূর্তিও ভেতরে সত্য হয়ে ওঠে, জীবন্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নিজের অন্তরই বিশেষ এক ধরনের শক্তি লাভ করে। তখন নিজেই নিজেকে, মন যা চায় তাই দান করে। বিশ্বাস করা চাই, বুঝলি বিশ্বাসের মত বিশ্বাস থাকা চাই। বিশ্বাস করতে করতে অন্তর শুদ্ধ হয়, অন্তর শুদ্ধ হলে তাতে জ্ঞানের প্রতিফলন হয়। ঘোলা জলে প্রতিবিম্ব ফোটে না, পরিষ্কার জলে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। অন্তর শুদ্ধ হলে অনেক কিছুই পাওয়া যায় রে। অন্তর শুদ্ধ হয় একাগ্রতায়। কপালে বিন্দু ধ্যান করলেও হয়, দেবতার মূর্তি ধ্যান করলেও হয়। নানা চিন্তাই বেনো জল, ঘোলা জল। এইসব চিন্তাকে সরিয়ে দিতে হবে মন থেকে। জমিতে আগাছা হলে ফসলের জোর কমে যায়। আগাছা উপড়ে ফেললে ফসল জোরদার হয়। মনের একাগ্রতা হল আগাছা উপড়ে ফেলা। ভক্তি হল নারলে যা আগাছা উপড়ে ফেলে।

কথা বলতে বলতে সিগারেটটা শেষ করে ফেলেছিল লোকটি। কথা শেষ হল এবং মুখটান দিয়ে সিগারেটের বাকি অংশটুকু সে ফেলে দিল।

লোকটাকে ক্রমশঃ আমার ভাল লেগে যাচ্ছিল। কথাগুলো সুন্দর। ভাববার মত, চিন্তা করবার মত। আর একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু লোকটা দেখি হাটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। দ্রুত পিছু এগিয়ে গেলাম, পাশাপাশি এসে বললাম, যদি—

—আবার কি ?

—আর একটা কথা…

—তুই বিনা পয়সায় মাষ্টারী করিস ?

চমকে উঠলাম, আমি যে কলেজে অধ্যাপনা করি লোকটি জানল কি করে ! বললাম, না।

—তবে দিন। পয়সায় আমি লেকচার দেবো। ভেবেছিস নাকি ?

—এ-সব লেকচার তো পয়সায় হিসেব হয় না।

লোকটা প্রায় ধমকে উঠল আমাকে, 'ছেড়ে দে কথা বাড়া।' তারপর হনহন করে হাঁটতে লাগল। মনে হল অত্যন্ত হাল্কা শরীর, মাটিতে পা পড়ছে কি পড়ছে না। চোখের পলকে এতদূরে চলে গেল যে আর ধরতে পারলাম না তাকে। তারপর আকাশে উড়ন্ত শকুনের মত মুহূর্তের মধ্যে ছোট হতে হতে যেন একটা বিন্দু হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য! এ পথিক লোকটা কে? কি আছে, কে বলতে পারে। আমাদের পঞ্চা লিখিয়ে যথার্থই লিখেছিলেন 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতে পার লুকানো রতন।' কাব্যের অলঙ্কার ও সুর এতে যদিও নেই, কিন্তু আকারের মধ্যে সোনার মত সত্য জড়ানো রয়েছে।

আশ্চর্য একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলাম মিশনের সেই ঘরটিতে। মিশনে দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে সারাদিন ধরে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করলাম। সন্ধ্যাবেলা নতুন দৃষ্টি নিয়ে গেলাম বিশ্বনাথ দর্শনে। সত্যি সত্যি সেদিন বিশ্বনাথকে নতুন ভাবে দেখলাম। দেখলাম সমস্ত বিশ্ব-সংসার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মহাশূন্য অন্ধকারের মধ্যে ইচ্ছা তরঙ্গ কোথায় যেন বিন্দুকারে উঠতে চাইছে। সেই বিন্দুপুর ইচ্ছা তরঙ্গের কেন্দ্রই হল শিবলিঙ্গ। মনে হল, কত, কত, কত লক্ষ যোজন দূরে এই শিবলিঙ্গ। সমগ্র দেশ (Space) অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে সেই তরঙ্গের জন্য। সেই অস্পষ্ট ইচ্ছা তরঙ্গ সমগ্র দেশব্যাপীই রয়েছে সমগ্র দেশই সেই তরঙ্গ, কিন্তু দেশ তা জানে না।

পরদিন দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে একটি সাইকেল রিক্সা নিয়ে বেরুলাম কাশীর আরো কয়েকটি দেবস্থান দেখতে। গেলাম দুর্গাবাড়ি, গেলাম মানসমন্দির, সঙ্কটমোচন, সব শেষে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। দেখলাম বিড়লার শিবমন্দির। দুর্গাবাড়িতে যেন মধ্যযুগ তার ধর্মবিশ্বাস আঁকড়ে রয়েছে। এজন্য কেমন একটা অগুরু মাতানো গন্ধ আছে।

মানসমন্দির আধুনিক কালের সৃষ্টি, কেবল দুধ পাতা হয়েছে, দই হয়ে জমেনি। সঙ্কটমোচনের ভিড়ই সব চাইতে বেশি। দেবতা জাগ্রত মহাবীর। উত্তর ভারতের লোকেরা ভক্তকেই ভগবানের চেয়ে বেশি করে মানে। তাই মহাবীর হনুমান তাদের সবচেয়ে বড় নির্ভরস্থল। নির্ভেজাল ভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হনুমান। নির্ভেজাল প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শ্রীরাধিকা। ভক্তির মধ্যে অন্তরের শক্তির প্রয়োজন বেশি, প্রেমের মধ্যে আন্তরশক্তির সঙ্গে চাই শিল্পের সংমিশ্রণ।

সঙ্কটমোচনের মন্দিরে দূর দুরান্ত থেকে ভক্তেরা এসে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে। কেউ দিনের পর দিন তুলসীদাসের রামচরিতমানস পড়ছে। আন্তর বিশ্বাসে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করবেই। যে কোনো আধুনিক লোকের কাছেই মনে হতে পারে, এ হল অন্ধতা। যেন মধ্যযুগীয় ভারতের বিশ্বাস নিয়ে এইসব লোক চিরকাল বঞ্চিত হয়ে থাকল। যেন এরা কিছুই পেল না। কিন্তু কে যে কী পেল, কে জানে। লণ্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন, মস্কো, জানিনা কে কাকে কি দিতে পেরেছে! ট্রাম, বাস, সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, রেঁস্তোরা, কেতাদুরস্ত জীবন, টি. ভি. আধুনিক আভিজাত্য, এ সব কি মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের চাইতে মানুষকে বেশি কিছু দিতে পেরেছে? মধ্যযুগীয় বিশ্বাসে এইসব লোকের হৃদয়ে যে স্নিগ্ধ সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বলে, শহরের নিয়ন লাইটে, মধ্যদিনের খরদাহে তা নেই। বিশ্বাসের স্নিগ্ধতায় এই লোকগুলি অনেক বেশি পেয়েছে। যে পাওয়ার অভাবে সমগ্র আধুনিক জীবনই আজ দিশেহারা। বিজ্ঞান সমুদ্রমন্থন করে যা তুলেছে তা হল গরল। বিশ্বাস সমুদ্রমন্থন করে যা তুলেছে তা হল অমৃত। এইসব মুর্খ প্রবঞ্চিত লোকগুলির মুখ দেখে মনে হয়, এরা যেন সেই অমৃত পান করেছে। চার্চিল স্ট্যালিন রুজভেল্ট খরহৃদাহে জর্জরিত হয়েছেন, অমৃতের ছিটে ফোঁটাও পাননি। গরল বিশ্লেষণ করে যন্ত্রণায় কাঁতড়েছেন, কাফ্‌কা, কামু, সাত্র্‌। কিন্তু বিশ্বাসের অমৃতে স্নিগ্ধ হয়েছেন মীরাবাঈ, কবীর, নানক, সুরদাস। কাফ্‌কার 'ট্রায়াল' কামুর 'প্লেগ' সাত্র্‌-এর

লে চেমিন' এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' মানুষের খরাক্লিষ্ট অন্তরে বৃষ্টির ধারা নামাতে পারেনি, বরং খরাব দাহকে তীব্রতর করেছে। আজও সুরদাস ও কবীরের দোহা হৃদয়ে বৃষ্টি ঝরায়। গরল যখন উঠেছে, তাকেও ফেলে দেওয়া যাবে না। সোয়াইৎসারের সমাধানই আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাধান—'Side by side with materialism we must cultivate spiritualism.' গরল থেকে বেরিয়ে সেই অমৃতের সন্ধান করছি আমি। কোথায সেই নির্ভেজাল অমৃত পাওয়া যাবে কে জানে।

চার

তিনরাত্রি কাশীবাস করার পর রওনা হলাম হরিদ্বারেব দিকে। ভাল লাগছিল কাশীকে, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনকে। কিন্তু আমার পুঁজি অল্প, সময় অল্প। কাশী হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবন এই চারটি তীর্থকে লক্ষ্য করে বেরিয়েছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে এইসব দেখে ফিরতে হবে। সময় যদিও বা পাব, অর্থের সঙ্কুলান হবে না বলেই তাড়াহুড়ো। সুতরাং বৃদ্ধ মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে হরিদ্বারের কনখল রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীর উদ্দেশ্যে তাঁর লেখা একটি পত্র নিয়ে হরিদ্বারের দিকে রওনা হলাম।

ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় ওঠা যায় না। রিজার্ভ কামরার টি টি. সিকে ধরে একটি শূন্য সিটে বসবার ব্যবস্থা করে নিলাম। ট্রেন চলতে লাগল।

ট্রেন চলেছে প্রবল বেগে। বিরাট এই উত্তরপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশের মাটির উপর দিয়েই দিনরাত এ গাড়িতে চলতে হবে। গাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা পূর্ণতার স্বাদ আছে। কল্পনা, চিন্তা, সবই তখন গাড়ির গতির সঙ্গে চলতে চলতে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়।

দু'পাশের ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান দৃশ্যও মনকে প্রবল আকর্ষণে টেনে নিয়ে যায়। বাইরে অর্থহীনভাবে তাকিয়ে কখনও দিলাম মনের মধ্যে ডুব, আবার কখনও তার বিচিত্র আকর্ষণে শূন্য মাঠ, দিগন্ত রেখার গ্রাম, আল্‌পথে পায়ে হাঁটা মানুষ, এইসব তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মাটি তখনও শুষ্ক, এক বিরাট শূন্যতা যেন মাঠের বুকে। তবু সেই শূন্যতার মধ্যেও কী এক বৈরাগ্য যেন বিরাজ করছে। এই শূন্যতার মধ্যেও জীবনের জন্য মানুষ সংগ্রাম করছে। দল বেঁধে কৃষকেরা কুয়ো থেকে মাঠে জল ঢালার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেই জীবন সংগ্রাম যেন আমাকে আকর্ষণ করতে পারছে না। জীবনের ঊর্ধ্বে কোথায় যেন এক রহস্যময় স্নিগ্ধতা আছে, সেই স্নিগ্ধতা আমাকে টানতে লাগল।

যখন মাঝে মাঝে গাড়ির মধ্যে মন ফিরতে লাগল তখনই ভিন্ন চিন্তার উদয় হতে লাগল। গাড়ি ভর্তি যাত্রী। অধিকাংশই আসছে কলকাতা থেকে। কত বিচিত্র মন, কত বিচিত্র কল্পনা! কত না বিচিত্র আশা একই গাড়ির মধ্যে যাচ্ছে। ওধারে কয়েকটি যুবক, চল্লিশ ঊর্ধ্বে কয়েকজন ভ্রমণবিলাসী, সুন্দরী বৌ, ছোট শিশু, নববিবাহিতা স্ত্রী, সবাই চলেছে একই জায়গায়, একই পথের উপর দিয়ে। কিন্তু সবাই কি একই ভাবছে? হরিদ্বার যেমন আমাকে ডাকছে জীবনাতীতের ইশারা নিয়ে, এদের সবারও কি তাই? না, এরা অধিকাংশই চলেছে ভ্রমণ করতে? জীবনাতীতের তীরে গিয়ে জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে? অহংকৃত সংগ্রহশালায় আরও একটি ভ্রমণসূচীর সংখ্যা বাড়াতে? মানুষের বিচিত্র মনের খবর যদি জানা যেত!

গাড়ি চলেছে, কত বিচিত্র ভাবনা আমি ভেবে চলেছি। শরতের শেষের দিন। দিন ছোট হয়ে আসছিল। দিন না গড়াতেই পশ্চিম আকাশে ম্লান আলোর আভা ফুটে উঠল। ধূসর মাঠের বুকে ক্রমশঃ বিষন্ন আলোর ছায়া চোখে পড়তে লাগল। কী এক সকরুণ কান্না যেন পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। এই কান্নার সুর বোধহয় সকলেই অনুভব করতে পারে না। কিন্তু আমি কেন যেন পারি।

কেন যে জীবনের উন্মাদনা, হাসির তরঙ্গ ছাপিয়ে শুধুই আমার বুকে কান্নার ঢেউ উথলে উঠে কে জানে। আমি কান পেতে সেই করুণ কান্নার সুর শুনতে লাগলাম। বহুদিনের হারানো অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে সেই সকরুণ কান্নার প্রবাহ যেন আমি অনুভব করতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে বাইরে সন্ধ্যা নামল চোখের উপর দিয়ে। গাড়ির ভেতর আলো জ্বলে উঠল, কিন্তু ভেতরে তাকিয়ে সেই আলো আমার দেখবার ইচ্ছা হলনা। আমি স্নিগ্ধ আগত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলাম আগামী স্টেশনের অপেক্ষায় টি. টি. সির কাছে আগেই জেনে নিয়েছিলাম যে, আগামী স্টেশনের নাম লক্ষ্ণৌ। এই লক্ষ্ণৌ ছিল একদা ভারতে ঐসলামিক সংস্কৃতির কেন্দ্র। লক্ষ্ণৌয়ের ঘরোয়ানা, লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজী, কোথায় না একদিন ভারতের হৃদয়কে স্পন্দিত করেছে। যদি অতীতে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যায় তাহলে দেখা যাবে লক্ষ্ণৌয়ের সেই দিনগুলিকে, যখন চাঁদনীচকে আসর জমিয়ে বসত বাঈজীরা। স্নিগ্ধ কাজলরেখা চোখে এঁকে কৃষ্ণশ্মশ্রু মুসলমান নবাব বাদশার পুত্রেরা আসতেন আসরে। কত না বিমুগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হত তখন। সেখানে মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর সীমিত অঙ্গনে নেমে আসতো স্বর্গের আনন্দধারা। কিন্তু সে আনন্দধারা বড় ক্ষীণ, বড় ক্ষণস্থায়ী। ইতিহাস সেই ক্ষণস্থায়ীত্বের যে সাক্ষ্য রেখে গেছে সেই সাক্ষ্যের ইঙ্গিত ক'জন ধরতে পেরেছে? অধিকাংশ মানুষই পারে না, আর পারেনা বলেই, প্রচলিত একটি কথা আছে—History repeats itself. ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি হয়, মানুষ আবার ভুল করে কাঁদে। সুখ শুধু হাতছানি দিয়ে ডাকে, ধরা দেয়না।

সন্ধ্যার তোরণ দিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি ঢুকল এসে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে। অনেকেই বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল গাড়ির ঝাঁকুনিতে। তারা হাত-পা গুলোকে একটু সতেজ করার জন্য প্ল্যাটফর্মে নামলো।

গাড়ি এখানে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়াবে, কেউ তাই ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওপারে শহরের প্রাঙ্গণ ছুঁতে গেল।

লক্ষ্ণৌ সবার মনে কি সাড়া তুলেছে জানিনা, আমার মনে একটি ছবি ভাসিয়ে তুলল, সে ছবি কবি অতুলপ্রসাদের। তাঁর সেই বিখ্যাত গানের কলিটি আমার মনের মধ্যে একটি করুণ সুরের প্রবাহ তুলল :

'একা আমি জীবনতরী বাইতে নারি।'

লক্ষ্ণৌতে ভাল খাবার দেয়, অনেককেই দেখলাম রাত্রির ভোজনের ব্যবস্থা এখানেই করে ফেললেন। খুব যে খিদের তাড়না আমি বোধ করছিলাম, তা নয়। তবু আমিও খাবার নিলাম। বেশ খানিকক্ষণ গাড়ি দাঁড়াল। খাবার শেষ হল। রাত তখন কেবল শুরু। যারা হাত-পা ছড়াতে প্ল্যাটফর্মে নেমেছিল, তারা ফিরে এসেছে। গাড়ি আবার চলতে শুরু করে দিল। যারা দলবেঁধে বেরিয়েছিল তারা পরস্পর কথা শুরু করে দিল। এবার বাইরে তাকিয়ে দেখবার কিছু নেই। কথা যেন একটা রহস্যময় অঙ্কের মত, স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে চলে। বিভ্রান্ত ছেলে যখন অনেকক্ষণ টানাপোড়েনের পর অঙ্কের কোন কিনারা করতে পারেনা, খাতাপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে চলে যায়, তেমনি অবান্তর কথাও শব্দের পর শব্দের সংঘাত সৃষ্টি ক'রে কিছুদূর এগুলেও শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত বোধ করে। কথোপকোথনে লিপ্ত ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে উঠে পড়ে। রাত প্রায় নটা নাগাদ দেখলাম কথা বন্ধ করে অনেকেই শোবার আয়োজন করছে। গাড়ির একটানা ঝাঁকুনি ও ঝমঝম্ শব্দ ছেলেদের ঘুম পাড়ানিয়া একঘেয়ে গান ও মায়ের জাদু দেশের ঝাঁকুনির মত চেতনাকে খুব দ্রুত ক্লান্ত করে তোলে। গাড়ির যাত্রীরা যেন সেই শিশুরই মত ঘুমের আমেজ আর সহ্য করতে পারল না। যে যার বাঙ্কে বিছানা বিছিয়ে শোবার আয়োজন করল।

আমার সিট থ্রি-টায়ার সিটের উপরের বাঙ্কে। নিচের বাঙ্ক যার রিজার্ভ করা সে শোবার আয়োজন করাতে আমাকে উঠতে হল। এই দীর্ঘ যাত্রায় আমিই একমাত্র নিঃসঙ্গ যাত্রী বোধহয়। নিঃসঙ্গ কিন্তু তবু

যথার্থ নিঃসঙ্গ নই। আমি যখন একা হই, তখন মনের মধ্যে আমার অসংখ্য কথা নিজেরাই খেলা করতে আরম্ভ করে। কথার সংঘাতে অপূর্ব স্পন্দন উঠে। সেই স্পন্দনে আমি স্পন্দিত হতে থাকি। এতক্ষণ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি আমার আপন মনের কানাকানিতে বিহ্বল হয়ে ছিলাম। অন্য যাত্রীরা শোবার আয়োজন করাতে আমাকে উঠতে হল। কিন্তু শোবার ইচ্ছে হল না আমার, অন্ধকারের রহস্যময় হাতছানা বার বার আমাকে বাইরের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে টানতে লাগল। আমি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সুন্দরী রমণীর ভেজা চুলের মত অন্ধকার গাড়ির গা কেটে কেটে যাচ্ছে। যেন ফাল্গুনের দক্ষিণ সমীরণে সেই স্নিগ্ধ কেশরাশি উড়ছে। নরম কাঁশফুলের মত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার চোখমুখ। শরৎচন্দ্র অন্ধকারের রূপ দেখতে পেয়েছিলেন, আমিও তার মনোহারিণী স্নিগ্ধরূপ দেখতে পেলাম যেন। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের মত এ এক অদ্ভুত অন্ধকার, যে অন্ধকার সম্পর্কে ঋষি কবি বলেছেন, 'তখন অন্ধকার ছিল ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন। অবিচ্ছিন্ন আদিম বারিতে আচ্ছন্ন ছিল সব।' সেই অন্ধকারের মধ্যে যেমন সৃষ্টিরহস্যের জবাব পেতে চেয়েছিলেন ঋষিকবি, আমিও যেন তেমনই কোন একটা জবাব খুঁজবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সবাই চলেছে হরিদ্বারে, জীবনের স্বপ্ন নিয়ে চলেছে জীবনাতীতের তীরে। কিন্তু আমার লক্ষ্য যৌবন নয়, যৌবনের স্বপ্ন নয়। সমস্ত সুখ, সমস্ত স্বপ্নকে আমি পেছনে ফেলে এসেছি। আমার প্রশ্ন সত্যের কাছে এবং অমৃতের কাছে, 'কি এবং কেন।' হরিদ্বার, স্থানীয় লোকের ভাষাতে হরদোয়ার, আমার কাছে যেন এক অমৃতলোকের তোরণ, যেখানে গেলে পশ্চিম দিগন্তে অস্তসূর্যের মত সে ইঙ্গিত দেয় ভিন্ন এক জগতের। সেই জন্যই সে 'হর' অর্থাৎ পরমপুরুষের দুয়ার, একই অর্থে 'হরি' অর্থাৎ পরমপুরুষের দুয়ার।

হরিদ্বার আগে কখনও দেখিনি, দেখতে চলেছি। অদেখা সুন্দরীই যেমন সবশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, তেমনই অদেখা স্থানও। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে দেখা মেঘদূতের সেই রহস্যময় দেশ যেন হরিদ্বার, যে দেশ সম্পর্কে কবি বলেছেন :

'ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান—
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে !

সেই হরিদ্বার সম্পর্কে আমি শুধু ভাবছি। অন্ধকারের পর অন্ধকার ঢেউ তুলে চলে যাচ্ছে বাইরে, আমি ভাবছি। না জানি কোন্ অনিন্দ্য সুন্দর জগতে গিয়ে পৌঁছব, যেখানে রয়েছে জীবনের পরম স্নিগ্ধতা, পরম সার্থকতা। গাড়ি চলেছে, বিনিদ্রনয়ান কবির মত আমিও ভাবছি তো ভাবছিই। ভাবতে ভাবতে কখন ক্লান্তির ভার অনুভব করেছিলাম, কখন নিজের বাঙ্কে এসে বিছানা বিছিয়ে শুয়েছিলাম, মনে নেই। যখন পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি অন্ধকার নেই, সূর্য না ফুটার আগে অন্ধকারের একটা ছায়ামাত্র রয়েছে। নিচে যাত্রীরা সবাই প্রায় সজাগ হয়ে উঠেছেন, বিছানাপত্র বাঁধাছাদা করছেন। হরিদ্বার আর বেশি দূরে নেই। উপরের বাঙ্কে নিজের ছোট্ট বিছানা গুটিয়ে নিয়ে আমিও নিচে নেমে এলাম।

রাত্রির নিদ্রার পর পৃথিবী যেন স্নিগ্ধ, সজীব এবং সুন্দর। অন্ধকারের ছোঁয়া পেয়ে বাইরের জগৎটাও যেন পাল্টে গেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিরাট পরিবর্তন এখন। কী এক স্নিগ্ধতা মাখানো দৃশ্য বাইরে! সকলেই দেখি বাইরে তাকিয়ে। অনেকেই বিছানাপত্র

বাঁধাছাদা করে একেবারে তৈরি। সংসার-ট্রেনের তুদিনের খেলা যেন শেষ। ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরছে। সংসার শেষ, মুক্তি উঁকি দিচ্ছে। মুক্তির অঞ্চলপ্রান্ত দেখা দিচ্ছে। আর একটু পরেই নিস্তরঙ্গ মুক্তির মহা সমুদ্র, গাড়ি সেখানে থামলেই সকলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শুষ্ক ধুসর মাঠের রুক্ষতা আর নেই, মাঠে মাঠে পাকা ধান। কুয়াশার মধ্যে জড়িয়ে সজল স্নিগ্ধ মাঠ। পাহাড় এখনো চোখে পড়ছে না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনতিদূরে পাহাড়ের আভাস। একটা নতুন গানের সুরে যেন প্রকৃতি ডাক দিচ্ছে।

হরিদ্বার-বা হরদোয়ার। এখানে হরিদর্শন বা হরদর্শন হয় অর্থাৎ পরমমুক্তি এপথ দিয়েই ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে নেমে এসেছে। শুনেছিলাম অপূব সুন্দর এই হরিদ্বার। প্রাচীনকাল থেকে সৌন্দর্য পিপাসুর নয়ন তৃপ্ত করে আসছে। কত সুন্দর হরিদ্বার তখনও দেখা হয়নি। কিন্তু মনে মনে কল্পনা করে রেখেছি, অপূর্ব! যা ভেবেছি, তাকেও নিশ্চয়ই অতিক্রম করে যাবে। ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকৃতি। প্রকৃতির এক বিরাট প্রভাব মানুষের উপর। সামান্য মাঠ, ঘাট, ঘাস, গাছ, নদী আমাকে দোলা দেয়। হরিদ্বার হয়তো আমাকে ব্যাকুল করে তুলবে। মনে মনে হরিদ্বারের সৌন্দর্য কল্পনা করে কতবার তার বুকে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। সেই হরিদ্বার সামনেই। আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। জীবনের এক পরম আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ হবে। হরিদ্বারের সৌন্দর্য চির নয়নমুগ্ধকর। এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই প্রাচীনকালে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ এর নাম দিয়েছিলেন—কো-ইউ-লো আর্থাৎ মায়াপুর। হাতমুখ ধোয়ার পর্যন্ত আমার ইচ্ছে হল না। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সামনের দিকে।

গাড়ি চলেছে। কিছুক্ষণ পরে দূরে মনে হল পাহাড়ের মত ধূসর রেখা দেখা যাচ্ছে। ঐ পাহাড়ের গায়েই নিশ্চয়ই হরিদ্বার। গাড়ি ঐ দিকেই তার পূর্ণ লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছে।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং। পাহাড়ের মাথায় মেঘের উপর সূর্যের

রঙের খেলা দেখেছি আমি। বর্ণচ্ছটার সেই মায়াপুরী এখনও ফুটে উঠেনি উত্তর প্রদেশের প্রত্যন্ত সীমায়। পাহাড়ও খুব উঁচু বলে বোধ হচ্ছে না। অথচ এইই নগাধিরাজ হিমালয়!

ঐ ধূসর পাহাড়ের রেখাই নিশ্চয় হরিদ্বার হবে। মনে হল আমাদের গাড়িটা যেন হরিদ্বারের গন্ধ পেয়েছে। যেন হারানো কোন রত্ন আবার চোখে দেখতে পেয়ে তার মধ্যেকার উতলা ভাবটা কেটে গেছে। এবার সে যেন নিশ্চিন্ত ভাবে চলেছে।

গাড়ি চলছে। পাহাড়টা আবছা থেকে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল। আবার কোথায় হারিয়ে গেল। ভাবলাম, হরিদ্বার কি তবে সমতল-ভূমিতে? কিন্তু আমার স্বপ্ন চিরকালই যে পাহাড়ের আশ্রয়ে হরিদ্বারের কল্পনা করে এসেছে।

গাড়ির গতি ক্রমশঃ শ্লথ হচ্ছিল। এবার সে থেমে গেল। কল্পনায় হেলাতে দুলাতে, নাচাতে নাচাতে সে কখন আমাদের হরিদ্বার নিয়ে এসেছে। হরিদ্বার স্টেশন, আমাদের মোক্ষধাম। যাত্রীদের মধ্যে নামবার জন্য তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। আমার বুকের মধ্যেও আকুলি বিকুলি করতে লাগল হরিদ্বারের মাটি ছোঁয়ার জন্য।

বেশ শীত। ব্যাগের মধ্যে গরম সোয়েটার ছিল বের করে গায়ে জড়ালাম। তবু যেন শীতের কামড় থাকছেই। কুলির জন্য যেন হাহাকার পড়ে গেছে স্টেশনে। আমার একটি মাত্র ব্যাগ। একজন লোকের মত ছোট বিছানা। কারো জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই দু'হাতে দুটো ঝুলিয়ে নেমে পড়লাম। বুকের ভেতর এক অব্যক্ত আনন্দ যেন মোচড় দিচ্ছে। কী দেখব কে জানে!

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সাইকেল রিক্সা আর টম্‌টম্‌ গাড়ি। একটা সাইকেল রিক্সা নিলাম। বললাম, চল, রামকৃষ্ণ মিশন যাব।

রিক্সা ছাড়ল। তখনও হরিদ্বারের প্রকৃত রূপ আঁচ করতে পারিনি। চলমান রিক্সা থেকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম কখন হরিদ্বারের সেই অপরূপ মন ভোলানো দৃষ্টি ফুটে উঠে তাই দেখার জন্য। স্টেশন

থেকে বেরুতেই একটি মূর্তি নজরে পড়ল। পথের মাঝখানে রেলিং ঘেরা। চার হাত। দুই হাতে মালা আর ডম্বরু। আর দুই হাতে মাথায় জল ঢালছে। অনবরত ফোয়ারার মত মাথায় জল পড়ছে। পেছন থেকে মূর্তিটাকে ঠাহর করতে পারিনি। গঙ্গা এপথেই মর্ত্যে নেমেছিলেন। ভাবলাম গঙ্গার মূর্তি। আমি এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতেই রিক্সাচালক বলে উঠল ঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবজী।

গাড়ি চালক, রিক্সা চালক, টাঙ্গা চালক, এরা শুধু চালকই নয়, এরা গাইডও। গাড়ি চালানো যেমন এদের কর্তব্য, নতুন যাত্রীদের স্থানের পরিচয় দেওয়াও তেমনি কর্তব্য। এতে এদের এক ধরনের আত্মপ্রসাদও আছে বোধহয়।

মৃত্যুঞ্জয় শিবের মূর্তি পেছনে ফেলেও গাড়ি এগিয়ে চলল। মিশন ঠিক হরিদ্বারে নয় কনখলে। হাওয়ায় শীতের আমেজটা যেন ক্রমশঃ বাড়ছে। চাদরটা মাথার উপর দিয়ে কান দুটো ঢেকে নিলাম। হাওয়া এত ঠাণ্ডা হবার কারণ, রিক্সা গঙ্গার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। ব্রিজ পার হয়ে রিক্সা এবার এগিয়ে চলবে ওপারে কনখল রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে।

হরিদ্বার এই প্রথম তার অবগুণ্ঠন খুলে দিল। হাওড়া ব্রীজ থেকে গঙ্গা দেখা চোখে এ সৌন্দর্য কল্পনা করা যায় না। পূবে কেবল সূর্য উকি দিয়েছে। দুধারে বাঁধানো গঙ্গা কানায় কানায় ভর্তি। কলকল খলখল অজস্র বীচিমালা স্রোতের বুকে ফুটে উঠে ছুটে চলেছে। সে এক অদ্ভুত অপূর্ব দৃশ্য। বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যায় না। শুধু অনুভব করতে হয়। অপ্রশস্ত অথচ গভীর গঙ্গার এপার ওপার সেতু দিয়ে বাঁধা। স্বপ্নের সেতু যেন। যেন জেগে নয়, ঘুমন্ত স্বপ্নে আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দেখছি। চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছে না। কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। শুধু মনে হয়, দেখি দেখি আর দেখি। ব্রাউনিং-এর The Last Ride Together-এর নায়কের মত বলে উঠি ঃ

'What if we still ride on, we two
With life forever old yet new,
Changed not in kind but in degree,
The instant made eternity.'

কিন্তু গাড়ি চলছে, সময়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থেমে থাকছে না। আমার মনে হল, থাক মিশন, থাক আশ্রয়, এখানেই বসে পড়ি কিন্তু রিক্সা এগিয়েই চলল। কিছুকালের মধ্যে গঙ্গার সেই অপূর্ব দৃশ্য ছাড়িয়ে রিক্সা চলল ভেতরের রাস্তা দিয়ে। মনের মধ্যে থাকল গঙ্গার ছাপ। রিক্সা চলতে লাগল—কনখলে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ অপূর্ব দৃশ্য রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যেন মনটাকে টেনে নিয়েছে। কটা দিন তো থাকব। এ কটা দিন গঙ্গার সুনির্মল জলরাশি ও অশ্রান্ত স্রোত দেখে যেন জীবন কাটাতে পারলে সার্থক হত।

সূর্যের রশ্মি ফুটে উঠেছে। শীতে জমে যাচ্ছিলাম। এবার যেন একটু আরাম বোধ হল। বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে রিক্সা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে ঢুকল কন্‌খল রামকৃষ্ণ মিশনের আঙিনার মধ্যে। সামনেই মিশনের এক মহারাজ দাঁড়িয়ে বাগানের কাজকর্ম তদারক করছিলেন। রিক্সাওয়ালা তাঁকে গিয়ে সেলাম জানিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি কাশীর রামকৃষ্ণ মিশনের বৃদ্ধ মহারাজের লেখা চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম।

কিন্তু জায়গা পাওয়া গেল না। মিশনাধ্যক্ষ স্বামীজী নেই। মহারাজ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। সুতরাং ফিরতে হল বটে, তবে মন ভাঙলো না। হরিদ্বারের প্রাণকেন্দ্র, বাঁধানো গঙ্গার ঘাট, সেতু, ব্রহ্মকুণ্ড—এসব ছেড়ে দূরে মিশনে থাকার কোন যুক্তি নেই। সুতরাং মিশনের জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে রিক্সাওয়ালাকে বললাম, ফিরে চল, গঙ্গার ধারে। ব্রহ্মকুণ্ডের কাছাকাছি কোথাও একটা ধরমশালা দেখে দাও।

রিক্সা ফিরল। গঙ্গার উপর সেতু পার হয়ে এপারে এল। সেই

অপূর্ব নীল জলরাশির অমলিন স্বচ্ছ প্রবাহ। কলকল খলখল শব্দে প্রাণের মধ্যে কিসের একটা আবেগ জাগে যেন। মৃত্যুঞ্জয় শিবের মূর্তি ঘুরে রিক্সা এবার এসে ঢুকল মূল হরিদ্বার শহরে।

সারা ভারতে হরিদ্বার যেন একটা ব্যতিক্রম। এমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাস্তা ভারতবর্ষে সম্ভব, বিশ্বাস করা যায় না। রাস্তায় একটা সুঁচ পড়লেও যেন দেখা যাবে। সিমেণ্ট আর পাথর দিয়ে ঢালাই করা রাস্তা।

তীর্থের হাওয়া লেগেছে হরিদ্বারে। অজস্র তীর্থযাত্রী ভেঙে পড়েছে। তাদের নিয়ে শহরে ঢুকছে টাঙ্গা, রিক্সা, প্রাইভেট কার, কত কি। অধিকাংশই ছুটেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। মুখে ক্লান্তি ও শঙ্কা সকলেরই, কোথায় আশ্রয় পাওয়া যাবে! পরম মোক্ষধামে এসে আশ্রয়ের অভাবে আবার ফিরে যেতে হবে না তো!

ভারত সেবাশ্রম থেকে কয়েকটি ধরমশালা, সব ঘুরিয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত রিক্সাওয়ালা আমাকে নিয়ে এল মেহেরচাঁদ ধরমশালার কাছে। দরজার সামনে রিক্সা থামিয়েই হাঁকতে লাগল 'মাইজী! মাইজী!' এক স্থূলাঙ্গী মধ্যবয়সী মহিলা বেরিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে রিক্সাওয়ালা কি কথা বলল—তারপর আমাকে মাইজীর সঙ্গে কথা বলতে বলল। ধরমশালার তত্ত্বাবধানের ভার মহিলাটির উপর। আমি এগিয়ে যেতেই বললেন, কতদিন থাকবেন?

বললাম,—তিনদিন।

মহিলাটি বললেন, কলকাতা থেকে বাবুলোক আগেই রিজার্ভ করে রেখেছেন। তিনদিন পরে আসবেন। তিনদিনের বেশি কিন্তু থাকতে পারবেন না!

কোথাও আশ্রয় মিলছে না, সুতরাং তাতেই রাজী হলাম। যে দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে তাতে তিনদিন কেন, তিন শতাব্দী হরিদ্বার থাকতে পারলেও আমার আপত্তি নেই। দেবতার স্পর্শ যেন সর্বত্র লেগে রয়েছে এই মহান তীর্থক্ষেত্রটির অঙ্গে। কিসের স্নিগ্ধতা! কী

একটা অতীন্দ্রিয় পরশ! পরের কথা পরে, আপাততঃ একটু স্থির হয়ে বসে মনপ্রাণ খুলে আমি এই অলৌকিক বা অতিলৌকিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই। মন প্রাণ ভরে নিতে চাই কাল বিলম্ব না করে। সুতরাং অবশেষে আশ্রয় পাওয়া গেল। রিক্সাওয়ালাকে বেশ ভালরকম বক্‌শিষ দিলাম।

আমার ঘর দোতালায়। তাড়াতাড়ি উঠে ঘরটা খুলে নিলাম। রাস্তার গায়ে ঘর। একেবারে বারান্দার গায়ে। গঙ্গামুখি। সামনে বারান্দা। রেলি আর জাল দিয়ে ঘেরা। বেশ পরিষ্কার।

অন্যসব কাজ পরে। বারান্দায় এসে প্রথমে বাইরে তাকালাম। রাস্তার ওপাশে দুটো বাড়ির ফাঁকে চলমান গঙ্গার স্রোত লক্ষ্য করা যায়। সূর্যরশ্মি গঙ্গার বুকে পড়ে চিক্ চিক্ করছে। স্বর্গের মণিমুক্তা যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে মর্ত্যের আয়নায়। হৃদয় মন যেন নেচে উঠতে চাইল আমার।

হিমালয়ের তুষার ছুঁয়ে আসা হাওয়া বইছে। নরম রোদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে শীতল হাওয়া। অপূর্ব লাগছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। আমার ঘরের ওপাশে রাস্তার উপর একটি মেয়েদের স্কুল। কিন্তু নাম লেখা 'আনন্দময়ী' কলেজ। গুটি গুটি মেয়েরা দেখি এসে দাঁড়াচ্ছে সেই স্কুলের সামনে। ছোট থেকে বড় সব রকমের মেয়ে। পাঞ্জাবী মেয়েদের মত পোশাক। সালোয়ার কামিজ। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী সবাই। মুখে একটিও কথা নেই। একটুও শব্দ নেই। নীরবে সবাই আসছে আর জড় হচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এর মধ্যে কোথায় যেন প্রাচীন তপোবন-ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার ছোঁয়া আছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। রোদ মাখানো শীতল হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে নিলাম। তারপর একসময় উঠে ধরমশালার বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে নিলাম। এবার আর ঘর নয়, ঘরের বাইরে বিপুল প্রকৃতিকে দুনয়ন ভরে দেখে নিতে হবে।

ক্রমশঃ সূর্যের উষ্ণ রশ্মি ঠাণ্ডা হাওয়াটাকে গরম করে দিচ্ছে ঠাণ্ডা মাখানো রোদে দিনের প্রথম প্রহর যেন অপূর্ব। ঘরে তালা দিয়ে নিচে নামলাম, পথে পা দিলাম। ইটালির সমস্ত রাস্তাই যেমন রোমের দিকে, হরিদ্বারের সকল রাস্তাই গিয়েছে হর-কি-পৌড়িতে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে। কিছুদূর এগুলেই বাজারের মুখে রাস্তা সরু, কিন্তু দীর্ঘ। দুইপাশে অজস্র বিপণী, কিন্তু বাণিজ্যের আধুনিক কর্কশ আবরণ পরে নেই যেন, কোথায় যেন বাণিজ্য সম্ভারের মধ্যেও এখানে একটা স্নিগ্ধতা। গরমপুরি, রসগোল্লা, রাবড়ি, মনোহারী জিনিষ সবই আছে।

মন আমার ব্যাকুল বাইরের বিপুল প্রকৃতির জন্য, যেখানে স্বর্গ ঝুঁকে পড়েছে পৃথিবীর উপর। সুতরাং সংকীর্ণ গলিপথের বেষ্টনী আমায় আটকে রাখতে পারল না। জোরে জোরে পা চালাতে লাগলাম ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে।

বাজারের শেষে ব্রহ্মকুণ্ডের চত্বরে পা দিতেই হাওয়ার মধ্যে শীতের কামড়ের তৎপরতা যেন ভয়ানক বেড়ে গেল। বরফগলা হিমালয়ের স্রোত প্রবল উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মকুণ্ডের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। তারই ছোঁয়া পেয়ে হাওয়াও হিমশীতল হয়ে উঠেছে ব্রহ্মকুণ্ডের চত্বরে। চাদরটা আটসাট করে টেনে নিয়ে সামনের দিকে তাকালাম।

সকালবেলার সূর্যের নিচে ব্রহ্মকুণ্ড নিজেও যেন একখণ্ড সূর্য, ঝলমল্ করছে। বাধানো গঙ্গার তীর, যেন স্বর্গের কোন সমুদ্রবেলা। সারি সারি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে মুক্তির নিচে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষকে। অমৃতলোকের ছোঁয়া পেয়ে সবাই যেন তাদের ক্ষুদ্র মনুষ্যসত্তার কথা ভুলে গেছে। মানুষ নিজের অন্তরস্থ বিরাট বিপুলকে উপলব্ধি করছে অমৃতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সামান্য কিছু ভিখারী আছে বটে, কিন্তু করুণ ভিক্ষা প্রার্থনা নেই, রাস্তায় উৎপাত নেই, তাদের খুঁজে বের করতে হয়।

গঙ্গার মূল প্রবাহ থেকে একটি প্রক্ষেপ পাশেই গোষ্পদের মত

তৈরি করেছে। সেখানে প্রায় স্থির-গোলাকৃতি জল-রাশির উপর হর-কি-পৌড়ি দাঁড়িয়ে। ধূপের সূক্ষ্ম ধুঁয়া মিষ্টি মধুর গন্ধ নিয়ে মন্দির থেকে মুহুর্মুহু বাইরে আসছে। স্নিগ্ধ পুণ্যার্থীরা মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পৌড়ি দর্শন করছেন। ব্রহ্মকুণ্ডের চত্বরে দাঁড়িয়ে কেউ বা তর্পণ করছেন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে। ঘাতসংঘাত, নিচুতা, কলহ-গ্লানি সব থেকে দূরে যেন এক আশ্চর্য জগতের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার শুধুই কেন যেন মনে হতে লাগল—চেনা, চেনা, চেনা। আমার রক্তের স্পন্দনের মধ্যে কোথায় যেন জড়িয়ে আছে হরিদ্বারের সঙ্গে একটা একাত্মতার সুর। ক্রমশঃ আমাকে যেন তা বিহ্বল করে দিতে লাগল।

স্বপ্নের রঙে বাঁধানো চাতাল। ব্রহ্মকুণ্ডের ওধারে একটি কীর্তিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে। ফুলওয়ালারা সারে সারে ছাতা মেলে তার নিচে ফুল নৈবেদ্য সাজিয়ে বসে আছে। ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে পুণ্য যেন স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে, তাই সেখানে আছে একটা স্থৈর্য। কিন্তু ওধারে খরস্রোতা পুণ্যসলিলা গঙ্গায় আছে যেন বেদমন্ত্রের ধ্বনি—যা অতি দূর কোন কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। ব্রহ্মকুণ্ডের স্থৈর্যের মধ্যে প্রশান্তি আছে, গঙ্গার কলস্রোতের মধ্যে সৃষ্টির বিপুল উচ্ছ্বাস।

কিছু লোক দেখি সেতুর উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গার স্রোতে মাছের জন্য খাবার ফেলছে, সঙ্গে সঙ্গে মাছের মেলা জমে যাচ্ছে নিচে। অসংখ্য, অগুণতি মাছ, মাছের স্রোত যেন, কিন্তু আমার মন তাতে আকৃষ্ট হল না। উত্তর দিগন্তে ছায়া-ছায়া-রেখা হিমালয়ের দিকে তাকালাম আমি। সেই ছায়ার চূড়ায় কোথাও হয়তো দীর্ঘ রেখা টেনে বরফ ছড়িয়ে আছে। পর্বত শীর্ষে সেই তুষার কীরিটে সূর্য ঝল্‌মল্‌ করছে। দেবতাত্মা হিমালয়ের ঐ উজ্জ্বল অঙ্গনেই স্বর্গের অস্তিত্ব। ঐ স্বর্গ লক্ষ্য করেই পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়েছিলেন। সেই দূর তুষার কীরিটের দিকে তাকিয়ে হৃদয় আমার আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

হরিদ্বারের গা ঘেঁষেই মনসা পাহাড়। সম্পূর্ণ ন্যাড়া একটি পাহাড়।

যেন মূল কেটে দেওয়া একটি গাছের মত মৃত। এই স্নিগ্ধ প্রাণপ্রাচুর্যের মধ্যে একখণ্ড মৃতের অস্তিত্ব যে কি করে সম্ভব, কে বলবে! কিন্তু গঙ্গার ওধারে একটু দূরে চণ্ডী পাহাড় শ্যামল অরণ্যে আবৃত। মনসা পাহাড়ের পাশ দিয়ে দেরাদুনের দিকে চলে গেছে রেল লাইন। যেন কোন্ এক রহস্যময় জগতের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে আছে এই পথটি। স্থান মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে। হরিদ্বার এলে তবেই তা বোঝা যায়। মনের সংকীর্ণতা দূর হয়ে কোন্ এক অচিন দেশের রাগিণী যেন হৃদয় তন্ত্রীতে বেজে উঠতে চায়। আমার কেবলই যেন মনে হতে লাগল, এখানে পাব, পাব, কিছু একটা পাব। যে সত্যের সন্ধানে আমার এই অভিযাত্রা, তা সফল হবে।

ব্রহ্মকুণ্ডের ধার থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা এগারটা বেজে গেল। ধরমশালায় তিনদিনের আশ্রয় পেয়েছি। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এখানকার যা কিছু দর্শনীয় দেখে নিতে হবে এবং সেই ফাঁকে খোঁজ করতে হবে সেইসব মহাপুরুষদের যাঁরা সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন।

ধরমশালায় ফেরার পথে একটি সিন্ধ্রি হোটেলে খাওয়া সেরে নিলাম। ঠিক করলাম ধরমশালায় ফিরে সামান্য একটু বিশ্রাম ক'রে তারপর হরিদ্বারের দর্শনীয় স্থানগুলি সেদিনই দেখে নেব। সুতরাং ফিরে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে পড়লাম। একা যাত্রী, রিক্সাই আমার পক্ষে প্রশস্ত। সুতরাং রিক্সা নিলাম। সে আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে সপ্তধারা আর কন্খল।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম হরিদ্বারের বিশ্রাম নেই। ভ্রমণবিলাসীদের প্রাইভেট কার, রিক্সা, টাঙ্গা সবই ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত, ছুটে চলেছে যাত্রীদের বহন করে। আমার রিক্সা চলতে লাগল ব্রহ্মকুণ্ডের দিকেই। ঐ পথেই যাবে সপ্তধারা। হরিদ্বারের পথ কলকাতার মত নোংরা নয়, ট্রামবাসের উৎপাত নেই, চলেছে বেশির ভাগই টাঙ্গা আর রিক্সা। যাত্রীদের অধিকাংশের চোখেই পুণ্যের নেশা। প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থায় আমার আস্থা নেই, গালগপ্পেও নেই। পুরাণ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার

বুকে নিষ্ঠুর আঘাত মাত্র। মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এই পুরাণ, যদিও অধ্যাত্ম পুরুষেরা পুরাণের গল্পের অন্তরালে বিরাট দার্শনিক সত্যের সন্ধান পান। পুরোহিত শ্রেণীকে প্রতারক হতে সাহায্য করেছে এই পুরাণ। ধর্মের নামে জাঁকিয়ে ব্যবসা করার পথ করে দিয়েছে। অধিকাংশ তীর্থস্থান যদিও সেই পুরাণের পটভূমিতেই বেড়ে উঠেছে তবুও হরিদ্বারে এসবকে ছাপিয়েও আকাশে-বাতাসে কী যেন ঘুরে বেড়ায়।

আমার রিক্সা এগিয়ে চলেছে। আমি পথের দুইদিকে তাকিয়ে দেখছি। বাজারের কোণ্ ঘেঁষে ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে উঁচু বাঁধের মত রাস্তা। রিক্সা চলেছে সেই উঁচু রাস্তা দিয়ে। পাশে রেল লাইন, পাহাড়ের গা দিয়ে চলে গেছে দেরাদুন পর্যন্ত। ব্রহ্মকুণ্ড ছাড়িয়ে উপরের রাস্তায় উঠতেই দেখা গেল রাস্তা তত সুন্দর বা পরিচ্ছন্ন নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হলেও কী একটা অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ যেন ছড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট যে বাড়িঘর, তার প্রত্যেকটির উপরই প্রায় হনুমানজীর মূর্তি আছে। ছোট ছোট মন্দিরেরও অভাব নেই। প্রত্যেকটি মন্দিরের পেছনেই দীর্ঘ হোক সংক্ষিপ্ত হোক কিছু ইতিহাস আছে। রিক্সা চালক বিড় বিড় করে তার পরিচয় দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এগুলির গুরুত্ব তেমন বেশি নয় বলে রিক্সা এখানে থামল না। রিক্সা থামল প্রথম এসে ভীম গোড়ায়। ব্রহ্মকুণ্ডের ধার থেকে প্রায় আড়াই ফার্লং দূরে।

জায়গাটার নাম শুনেই চমক লাগল। বললাম, এটা কি?

রিক্সাচালক বলল, ভিতর মে যাইয়ে, দেখিয়ে।

পাহাড়ের গায়ে ভীম গোড়া, নেমে ভেতরে গেলাম। ছোট্ট একটি গুহা, পাশে স্নানের সরোবর। অনেকেই পুণ্যার্জনের আশায় সেখানে স্নান করছে। পাহাড়ের গায়েই ছোটখাটো একটা মন্দির, পাণ্ডাও আছে। কেউ পূজো দিলে পূজো করাচ্ছে। চরণামৃতের বিনিময়ে পূজারীর কাছে অনেকে পয়সা ফেলে যাচ্ছে।

ভীম গোড়া থেকে আরো কিছুদূর এগুলে গঙ্গা হিমালয় থেকে

নেমে বিশেষ একটি জায়গায় সাতভাগে বিভক্ত হয়ে হরিদ্বারের কাছে এসে আবার এক হয়েছে। এই সপ্তধাবার একটি ধারা ভীমগোড়ার একদিক দিয়ে ঢুকে আর একদিক দিয়ে গঙ্গায় এসে মিশেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের মত এর একটা প্রবাদিক ইতিহাসও আছে। প্রবাদ হচ্ছে এই যে, গঙ্গা যখন মর্ত্যে নামেন এখানে ভীম তাঁকে পথ দেখাবার জন্য পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। ভীমের পায়ের হোঁচট লেগে এখানে একটি গুহা তৈরি হয়। কুণ্ডের নিচে আঠারো ফুট একটি গুহা আছে, সেটাই নাকি ভীমের পায়ের আঘাতে হয়েছিল।

পুরাণ আর প্রবাদ উভয়ই সত্যের পথে মারাত্মক বিঘ্ন। এই বিপুল বিস্তার প্রকৃতির স্পর্শের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ রয়েছে—তারই মধ্যে সত্যপিয়াসী পুণ্যার্থী সত্যের স্বরূপ জানতে পারেন। সত্য যেখানে উন্মোচিত হবার জন্য অপেক্ষায় বসে—সেখানে তাকে আবরিত করবার এই চেষ্টা যে কেন, কে বলবে! ভারতবর্ষের ধর্মের সব চাইতে বেশি ক্ষতি করেছে ব্রাহ্মণ শ্রেণী। তাঁরা পূজো-আর্চা ও তাদের প্রাধান্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানা ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপের সৃষ্টি করেছে। অনার্য কতকগুলি বিশ্বাসের ধারাকে গল্পের রূপ দিয়ে তাঁরাই পুরাণ সৃষ্টি করেছে। তারা যে কী না করেছে, বলা যায় না। হিন্দু সংস্কৃতির ধারক হল ব্রাহ্মণ একথা আর যেই বিশ্বাস করুক আমি করি না। বেদ আর্যদের নানাশ্রেণীর একশ্রেণীর সৃষ্টি। তখন তারা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত ছিল কিনা ইতিহাসও তা স্পষ্ট করে বলতে পারবে না! বেদের সংহিতা পর্বে সত্যের জন্য আকুলি-বিকুলি থাকলেও পূর্ণ সত্যের স্বরূপ নেই। সেই সত্যের স্বরূপ আছে উপনিষদে। আর্য ও অনার্য মনীষার সংমিশ্রণেই উপনিষদের সৃষ্টি বলে মনে হয়। উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা, তর্কবিদ্যা নয়। ষড়দর্শন তর্কবিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মবিদ্যাকে বোঝাবার চেষ্টা। ব্রহ্ম-স্বরূপ উপলব্ধি ষড়দর্শনে হবে না। এদের মধ্যে একমাত্র মূল্যবান হল যোগশাস্ত্র। কিন্তু এই যোগশাস্ত্রের উদ্ভাবক পতঞ্জলিই প্রথম নন। যোগব্যবস্থা আগেও ছিল। আমার বিশ্বাস আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ

করবার আগেই যোগ সাধনার ধারা ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় বীরাসনে বসা পশুপতির মূর্তি সেকথা প্রমাণ করে। এই আসনই আজ যৌগিক ব্যায়ামে ভদ্রাসন নামে পরিচিত। ভদ্রাসনে বসে কপালে বিন্দু ধারণা করার সার্থকতা যে কতখানি যাঁরা ধ্যান করেন তাঁরাই একথা বুঝতে পারবেন। যোগ সাধনা মূলতঃ অনার্য। এই যোগই পরবর্তীকালে তন্ত্রের রূপ নিয়েছে। এই যোগ বা তন্ত্র যা ব্রহ্মস্বরূপ বোধে নির্ভুল পথ, তা ব্রাহ্মণদের অবদান নয়। ব্রাহ্মণরা ধর্মকে ব্যবসার সামগ্রি করেছে। সেই ব্রাহ্মণ্য মানসিকতাই পরম মুক্তির দুয়ারেও দেখলাম জাঁকিয়ে বসেছে। এই মানসিকতা ঐতিহাসিক সত্যের ধারও ধারে না। সেইজন্য এই মানসিকতা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে জোলা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করে এবং ভীমগোড়ায় রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে অনায়াসে মহাভারতকে জুড়ে দেয়। রামচন্দ্রেরও আগে সূর্যবংশের এক প্রাচীন পুরুষ ভগীরথ, পরবর্তী কালের মহাভারতের ভীমের সমসাময়িক হয়েছেন। সত্যের কী অপলাপ! সাধারণ মানুষকে এই প্রচলিত ধর্মব্যবস্থা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। ভীম গোড়ার পাণ্ডাদেরও গৈরিক বা রক্তাম্বর পরা কলকাতার ভিখারী সাধকদের মত মনে হল।

পুরাণ আমার আকর্ষণ নয়, গুলগপ্পও নয়। আমার লক্ষ্য সত্য। দার্শনিক Hume-এর মত সে সত্য আমার কাছে, 'Truth without God.' সেই সত্যের কোন ধারকই আমার এই অভিযাত্রার লক্ষ্য। কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে সে রকম এক সত্যের ধারককে আমি দেখেছিলাম। তারপর আর কোথাও নয়। আমার মন এই উদার প্রকৃতির নিচে তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুতরাং ভীমগোড়া আমাকে খুশি করতে পারল না। আবার রিক্সায় এসে চাপলাম। রিক্সা এগিয়ে চলল।

প্রাচীন ভারতের অন্তরাত্মা যে ভারতবর্ষকে ছেড়ে যায়নি উত্তর প্রদেশের এই প্রত্যন্ত সীমায় এসে সেটা বোঝা যায়। যদিও পৌরাণিক আর প্রবাদিক ধর্মবিশ্বাসের এখানে ছড়াছড়ি, তবুও তা ছাপিয়েও কোথায় যেন কী একটা আছে! জীবনটাকে পুতিগন্ধময়

মনে না হয়ে কিসের একটা পবিত্র গন্ধ অনুভব করা যায় যেন। সাধু সন্ন্যাসীর ছড়াছড়ি এখানে, যদিও সবাই খাঁটি সাধু নয়। প্লাষ্টিকের সবুজ আর ঘাসের সবুজ ভিন্ন হলেও, সবুজের একটা স্নিগ্ধতা প্লাষ্টিকেও আছে। সাধু খাঁটি না হলেও তাঁর গৈরিক বসন মনের মধ্যে একটা ভিন্নতর ভাব জাগায় বৈকি! বিশেষ করে যদি উদার প্রকৃতির নিচে কেউ গৈরিক বসন পরে। শুধু সাধুসন্ন্যাসীর দেহে নয়, প্রকৃতির সর্বাঙ্গেই এখানে কেমন যেন একটা গৈরিক ভাব বিদ্যমান। সর্বত্রই যেন তপোবনের একটা ছায়া।

রিক্সা এগুচ্ছে। প্রকৃতি ডাকছে উদার সুরে। অন্তরতম কে যেন নিজেকে উন্মোচিত করবে বলে ইশারা দিচ্ছে। তারই মধ্যে একটা দৃশ্য যেন আমাকে ব্যথা দিতে লাগল। পথের দু'ধারে অনেক ক্ষেত্রেই সন্ন্যাসীদের জন্য অট্টালিকা উঠছে। অট্টালিকাই যদি প্রয়োজন তাহলে ঘর ছেড়ে এঁরা বাইরে এলেন কেন?

পথের ধারে ধারে মন্দির উঠছে নিত্য নূতন। এদের অধিকাংশই গড়ে উঠছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। এমন একটা বড় মন্দিরের কাছে রিক্সা-ওয়ালা এসে রিক্সা থামাল। রাম সীতার মন্দির। তখনো এখানে কাজ চলছে। উঠানে প্রবেশ করতেই প্রাচীন রামায়ণের গল্প অনুসরণে একটি কাহিনীর ভাস্কর্য দৃশ্য—হাতী কুমিরের লড়াই। নারায়ণকে পিঠে নিয়ে উড়ন্ত গড়ুর এসেছে হস্তীকে রক্ষা করতে। ছেলেবেলা বাইরের ঘরের দক্ষিণের জানালার ধারে বসে, উর্ধ্বে সুনীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে মাঝে মাঝেই আমার মায়ের একটি ছেঁড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তাম। তখন অন্ধবিশ্বাসে সমস্ত কাহিনীটাকেই সত্য বলে মনে হত। মন এক অদ্ভুত জগৎ তৈরি করে অতীন্দ্রিয়তার স্বাদ পাবার চেষ্টা করত। কথক ঠাকুরদের কল্যাণে এই পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাসই ভারতীয় জনচিত্তে তথাকথিত ধর্মবোধ সৃষ্টি করেছিল। এই ধর্মবোধ বহু লোককে প্রতারিত হতে সাহায্য করেছে। ভারতীয় অধ্যাত্ম সত্য থেকে এই ধর্মবোধ অনেক দূরে। তবু, তবু, কী একটা মূল্যবোধ এর ছিল নিশ্চয়ই।

জীবনকে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেয়নি। শিল্পসমৃদ্ধ আধুনিক জীবনের পাশে গ্রামের সেই কথক ঠাকুরের গড়া সামাজিক জীবনকে স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময় মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান আছে, শান্তি নেই। প্রাচীন গ্রাম্য জীবনে অন্ধতা ছিল, বিজ্ঞান ছিলনা, কিন্তু কোথায় যেন একটা শান্তির প্রলেপ ছিল। কবিগুরু এই জন্যই যথার্থ বলেছিলেন– 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।'

এ আধুনিক সমাজ থেকে পিছিয়ে যাবার আর উপায় নেই। অথচ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে এ সমাজের কাছে সমর্পণ করার অর্থ হল— আত্মহনন। সুতরাং বাচতে হলে আধুনিক বিজ্ঞানের পাশাপাশি চর্চা করতে হবে অধ্যাত্মতার। সোযাইৎসার তাই যথার্থই বলেছেন, 'side by side with this modern development we must cultivate spiritualism.' Hume-এর সত্যসাধনা নির্মম সত্য-সাধনা, তাই তিনি বলেছেন, Truth without God. Kant এর সত্যসাধনা, একটু মিথ্যে মিশ্রিত সত্য সাধনা—God without certain truth. পৌরাণিক আর প্রবাদিক ধর্মবিশ্বাস, যা মানুষকে এতদিন ধরে রেখেছিল, তা বোধ হয় কাণ্টীয় সত্য। অমৃত সর্বদা লভ্য নয়। গরলও কখন অমৃতপ্রায় কাজ করে। বিষ দ্বারা বিষ ক্ষয় হয়, বিষ অষুধের কাজ করে। মানব সভ্যতার অসুখের জন্য বোধহয় একটু মিথ্যার বিষও প্রয়োজন আছে।

সে-সব কথা থাক। যে মন্দিরের কথা বলছিলাম—সেই মন্দিরের কথাই বলা যাক। মন্দিরের দেবতা হলেন রাম-লক্ষ্মণ সীতা। মূর্তির চার ধারে আর্শী জাতীয় কাঁচ ফিট করা যাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে এক রাম সীতা লক্ষ্মণের মূর্তি বহু হয়েছে। দেহাতী লোকেরা তা দেখে বিস্ময় বোধ করছেন। ভগমানজী শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতা দেখছেন। দেবতা মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে যথাসর্বস্ব মন্দিরের জন্য দান করছেন। সেজন্য মন্দিরের মালিকদের আয়োজনের ত্রুটি নেই। ধর্মগদি তৈরী করা হয়েছে। মাথায় পাগড়ি, গায়ে মখমলের পাঞ্জাবী

ছ'তিনটে ফোন নিয়ে বসে আছেন মারোয়ারী পুঙ্গবেরা। উত্তর ভারতের বিত্তবান ঘরের মহিলারা মেঝের উপর ভক্তিনম্রভাবে বসে। সামনে টাকার বাক্স। অনেকেই পঞ্চাশ টাকা একশ টাকার নোট দিব্যি দিয়ে যাচ্ছেন। সাধারণ যাত্রীরা এক টাকা দু' টাকা থেকে দু' আনা চার আনা পর্যন্ত দিচ্ছেন। তাদের দিকে মন্দির অধ্যক্ষদের ফিরে তাকানোর সময় নেই। বিত্তশালীদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন অর্থ দিয়ে স্বর্গও কেনা যায়। যিশুখ্রীষ্টের জন্য দুঃখ বোধ হয়, তিনি কেন যে বলেছিলেন, সূঁচের ফুটো দিয়ে উটের প্রবেশ সম্ভব হলেও স্বর্গের দুয়ার দিয়ে ধনী লোকের প্রবেশ সম্ভব নয়! এই ধরনের মন্দির ও তার ব্যবসায় ধর্মের নামে প্রহসন। এই প্রহসনকে লক্ষ্য করেই Karl Marx বলেছিলেন—'Religion is opium of the people.' কিন্তু তবু তো লোকে আফিং খায় নানা যন্ত্রণা দূর করার জন্য!

এ সব দেখতে আমি ঘর ছেড়ে বেরুইনি। চাই সেই মানুষ দেখতে যাঁর মধ্যে ভারতীয় অধ্যাত্ম ও স্ফটিকের মত দানা বেঁধেছে। হরিদ্বারে এসে এখনো তেমন কোন সাধু সন্ত নজরে পড়েনি। সুতরা তাড়াতাড়ি রিক্সায় ফিরে এসে বললাম, আগ্ বাড়ো।

আবার রিক্সা এগিয়ে চলল। আবার প্রকৃতি তার উদার বিপুল হৃদয় মেলে দিয়ে হাসছে যেন। যেন বলছে আছে, আছে; খুঁজে দেখ আছে। হৃদয়ের মধ্যে যেন আকুলি বিকুলি করে উঠল। কোথাও হয়তো আছে, রহস্যময়ী রমণীর মত অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে আছে সেই সত্য। হয়তো কোথাও তাকে পেয়ে যাব।

রিক্সা এগিয়ে চলেছে। দৃশ্য অতুলনীয়। ওধারে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে: বাঁধের উপর দিয়ে রিক্সা চলেছে। দু' ধারে পাহাড়। ওদিকে পাহাড়ের উপর কোথাও হয়তো দেবস্থান। কিন্তু সর্বত্রই কোথায় যেন একটা গৈরিক উত্তরীয় বসানো। দার্জিলিং যে উঠতে গেলে এমনতর দৃশ্যে মনের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়। সে রস কাব্যের স্নিগ্ধতায় ভরা। এখানে যেন মহাভারতের বুক থেকে মহাকাব্যের একটা ধ্বনি উঠছে।

প্রকৃতি ঘনীভূত হয়ে আসছে। আমি তন্ময় হচ্ছি। হঠাৎ রিক্সাটা থেমে গেল। একটা পথ হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। বাঁ দিকে একটা মন্দির। ডান দিকে ভাঙা পথ গঙ্গার দিকে নেমে গেছে। অরণ্য মহা সমারোহে সুদূর হিমালয় থেকে হাতছানী দিচ্ছে। সেই অরণ্য নিবিড় ছায়া ফেলে এই অবধি নেমে এসেছে। রিক্সাচালক বলল, গঙ্গা মাইজী কো দেখকে আইয়ে।

নামলাম। চোখে তখনও প্রকৃতির ঘোর। নুড়ি বিছানো ভাঙ্গা পথ নেমেছে গঙ্গার দিকে। সেই পথে পা দিলাম। একটা বাবলা গাছের নীচে একক একজন সন্ন্যাসী। বয়স অল্প। কথা বলে না। কাছে একটা হিন্দী সংবাদপত্র। একজন কৃষকশ্রেণীর লোক বোধহয় এই মাত্র মহারাজকে গঞ্জিকা সেবন করিয়ে উঠল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম। যে অমৃতের সন্ধানে বেরিয়েছি, কোথাও তার সেই অমৃত দেখতে পেলাম না। আমি যথার্থ বিচারক নই। তবু মন থেকে তেমন সাড়া পেলাম না বলে দাঁড়ালাম না।

তার দিয়ে একটা ঘেরা জায়গা ডান দিকে। একজন সন্ন্যাসীর সমাধি। নশ্বর দেহ তিনি এখানে রেখেছেন, আর অমৃতময় বাণী ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন ভক্তজনের মধ্যে। তাঁকে দেখা হল না। আরও নামলাম গঙ্গার দিকে। লক্ষ লক্ষ উপলখণ্ডের উপর দিয়ে গঙ্গা এখানে বয়ে যাচ্ছে তরতর্ করে। জলের গভীরতা নেই। এক হাঁটুও হবে না। কিন্তু স্রোত প্রবল। সরকারী ফলকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা আছে, স্রোতের মধ্যে কেউ যেন পড়ে না যান।

একখণ্ড পাথরের বুকে দাঁড়ালাম। পায়ের নিচ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাথর খণ্ড গড়িয়ে যাচ্ছে সেই স্রোতের তাড়নায়। আরো দূরে গঙ্গা, বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত। মুখ্যত এখানে গঙ্গার ধারা সাতটি। হরিদ্বারের কাছে এক হয়ে মিশেছে। দৃশ্য অতুলনীয়। তাকালে যেন আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। হরিদ্বারের গঙ্গায় মানুষের সৃষ্টিশক্তির স্পর্শ

রয়েছে। এখানে জগদ্বীশ্বরের অকৃত্রিম শিল্প-কৌশলের প্রকাশ। সপ্ত ধারায় গঙ্গা এখানে প্রবাহিত বলে স্থানের নাম সপ্তধারা।

গঙ্গা এখানে সপ্তধারায় প্রবাহিত হবার পেছনেও গল্প আছে। ভগীরথ যখন এপথে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন, তখন সাতজন ঋষি এখানে তপস্যা করছিলেন। পাছে ঋষিরা ভেসে যান, তাই গঙ্গা এখানে সপ্তধারায় বিভক্ত হয়ে মর্ত্যের দিকে এগিয়েছেন। এই সাতজন ঋষি হলেন, গৌতম, ভরদ্বাজ ইত্যাদি করে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সাত গোত্রপ্রধান। এ হেন গল্পে বিশ্বাস করা দায়। অথচ এ ধরনের গল্প পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় একদিন ছিল। ভারতবর্ষের দুর্গা ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চল ও এশিয়া মাইনর থেকে বিচ্ছিন্ন নন। শিব বিচ্ছিন্ন নন মিশর ও গ্রীস থেকে। পৃথিবীর প্রাচীন গল্পকথাগুলির মধ্যে কি করে একটা যোগাযোগ হয়ে গেছে। সপ্তধারার এই সাত গোত্র-প্রধানও বোধহয় বিচ্ছিন্নভাবে ভারতে একক ভাবে উদ্ভূত নন। প্রাচীন মেসোপোটেমিয়াতেও এর তুলনা খুঁজে পাওয়া যায়। সাতটি গোত্র-প্রধানের কল্পনা সম্ভবতঃ একসময় ভারতের সাতটি বিখ্যাত নদী দেখেই করা হয়েছিল। প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ার সাতজন ঋষিও এঁদের উৎপত্তির কারণ হতে পারেন। প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতাতেও অনেকে এই সন্ন্যাসীদের অস্তিত্ব খুঁজে পান। এই গোত্রপ্রধানদের মধ্যে অধিকাংশকেই অনার্য বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

আর্য অনার্য অর্থ কি জানি না। কারো মতে আর্য অর্থ মহান; কারো মতে 'গতিময়'। কিন্তু অনার্যরা অমহান বা গতিহীন একথা বলা যায় না। বের্গসঁর বহু আগেই অথর্ববেদে গতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। অথর্ববেদ অনার্যদের অবদানে ভরপুর। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের হিন্দু সংস্কৃতিতে ৯৫ ভাগ যদি অনার্যদের দান, আর্যদের দান তবে পাঁচ ভাগ। একথা প্রমাণসহ আমি আমার 'মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে' গ্রন্থে বলেছি।

আর্য অনার্য নয়, আমাকে অভিভূত করছে ভারতের সনাতন ধর্ম।

জগতে সমস্ত অসনাতন ধর্মেরই অবলুপ্তি ঘটেছে। প্রাচীন মিশরীয়, মেসোপোটেমীয়, গ্রীসীয় ও রোমক, কোন ধর্মই আর নেই। কিন্তু ভারতের সনাতন ধর্ম আজও অক্ষত, অবিকৃত। এই সনাতন ধর্মের উদ্ভাবক আর্য বা অনার্যরা নন। ভারতের মৃত্তিকাতে এই ধর্মের আত্মপ্রকাশ আপনা আপনিই হয়েছে। এই হল স্থান মাহাত্ম্য। ভারতবর্ষ মুক্তির কেন্দ্র বা চুম্বক। একে কেন্দ্র করেই বিশ্বধর্ম ঘুরছে, ঘুরবে। পৃথিবীতে বর্তমানে বোধহয় একটি ধর্মই টিকে আছে, তা ভারতের সনাতন ধর্ম। অন্যান্য ধর্ম তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছে এই ধর্ম থেকেই। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈনধর্ম ভারতের সনাতন ধর্মেরই অঙ্গ। একসময় বৌদ্ধধর্ম সমগ্র মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়াকে প্লাবিত করেছিল। বৌদ্ধ জাতক যেমন 'ঈশপস ফেবল'কে প্রভাবিত করেছে, তেমনই ধর্ম করেছে খ্রীষ্ট ধর্মকে। সেই কারণেই খ্রীষ্টানদের Sermon on the Mount বৌদ্ধদের কাছে নতুন কিছু নয়। যিশুখ্রীষ্টের জীবনের বহু অলৌকিক কাহিনী, যেমন জলের উপর দিয়ে হাঁটা, গৌতম বুদ্ধের প্রাচীনতম জীবনীর মধ্যেও রয়েছে। বাইবেলের প্রেম ও নীতির বাণী বৌদ্ধধর্মে অনুপস্থিত নয়। আর একথা সকলেই জানেন যে, হজরত মহম্মদ তাঁর ধর্মজীবনের প্রেরণা পেয়েছিলেন খ্রীষ্টানদের সংস্পর্শে এসে। সুতরাং জগতের শ্রেষ্ঠ বর্তমান ধর্মগুলির মধ্যে—যেমন বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইসলাম কোথায় সনাতন ধর্মের প্রভাব নেই? প্রভাব আছে এই কারণে যে, সনাতন ধর্ম, সত্য ধর্ম, সেখানে ঈশ্বরের উর্ধ্বেও সত্যকে সন্ধান করা হয়েছে। সেখানেই যথার্থ সত্যের উপলব্ধি হয়েছে।

সনাতন ধর্মের সেই সত্য, বেদ, উপনিষৎ, উপনিষৎ ভাষ্য, ষড়দর্শন, নানা শাস্ত্র ও দর্শনের সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু সত্য যখন অনুচ্ছিষ্ট তখন তাকে জানা হল আংশিক জানা। সত্যকে জানা যায়না, সত্য হতে হয়। সেই সত্য হয়েছেন, ভারতবর্ষে এমন মহাপুরুষ বহু জন্মেছেন। সত্য এখানে জীবনের মধ্যে প্রস্ফুটিত। আমি সেই জীবন্ত সত্য দর্শনে বেরিয়েছি, তত্ত্ব ও তথ্যের জন্য নয়। সুতরাং তথ্যকথা থাক।

সপ্তধারার উপলখণ্ডের বুকে দাঁড়িয়ে আমার চোখ তাই শুধুই খুঁজে বেড়াতে লাগল—সত্যদর্শী কোন মহাপুরুষকে। সপ্তধারায় বিভক্ত গঙ্গার প্রতি দুই ধারার মাঝখানে একটি করে দ্বীপের মত। শ্যামল অরণ্য আচ্ছাদিত করে আছে সেই দ্বীপ। আমার মনে হল, সেই আচ্ছাদনের অন্তরালে কোথাও হয়তো থেকে থাকবেন সেই সত্যদর্শী মহাপুরুষ। কিন্তু সেখানে যাবার উপায় নেই। এই সপ্তধারা, যেখানে অমৃতসিঞ্চনের স্পর্শ রয়েছে, এখানেই নাকি কুরু সম্রাট ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি বিদুর তপস্যা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন। এমন গঙ্গার স্নিগ্ধ আকর্ষণ যে, মনে হয়, তাঁদেরই মত যদি তপস্যা করতে পারতাম এই পুণ্যক্ষেত্রে বসে!

অলৌকিকের পাশে একটা লৌকিক চিন্তাও জড়াজড়ি করে এল যেন। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এই যে ক্ষীণধারাগঙ্গা, এই হল ভারতবর্ষের প্রাণ! এই গঙ্গাই ভাগীরথী আর পদ্মার বিশাল রূপ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে। সেই গভীর ও সুবিস্তৃত নদীগুলির উৎস যে এত ক্ষীণ বিশ্বাস করা যায়না। এটাই বোধহয় নিয়ম। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবনের তরঙ্গ, গতি ও উচ্ছলতা যত বেশি, শেষে তত নেই। শেষে স্রোত কম, বিস্তার বেশী, গভীরতা বেশি। চপল শিশু যেমন বৃদ্ধ হয় তেমনই। শৈশব, বাল্য ও যৌবনের চটুলতা বার্ধক্যে অভিজ্ঞতার ভারে ব্যাপ্ত ও গভীর। নদীর উৎস সাগর। মেঘ হয়ে হিমালয়ে গিয়ে আবার বৃষ্টিধারায় নদী হয়ে ছুটে নিচে নামে। সেই সাগরের কাছে এলে তার গতি ম্লান হয়ে যায়, গভীরতা বাড়ে। গঙ্গার উৎসের ক্ষীণধারা বুঝি সেই কারণেই।

যা সত্যিকারের সুন্দর তা দেখে বোধহয় কোনদিনই দেখার তৃষ্ণা মেটে না। Ode on Grecion Urn-এ এই কারণেই বোধহয় Keats লিখেছিলেন:

For ever wilt thou love and she be fair.

তাকিয়ে দেখে দেখে নয়ন ভরছিল না। কিন্তু সীমিত মানব জীবনে

পরিতৃপ্তি কোথায়। মানবজীবনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে মহাজীবনের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই মানুষের পরিতৃপ্তি, তার আগে নেই। মহাসাধক ও যোগীপুরুষের পক্ষেই সেটা সম্ভব, সাধারণ মানুষের পক্ষে নয়। সুতরাং চোখের ক্ষুধা অপরিতৃপ্ত রেখেই আমাকে ফিরতে হল। সপ্তধারার জল ছুঁয়ে আবার ফিরে এসে রিক্সায় উঠলাম। কাঁকর বিছানো রাস্তা ধরে রিক্সায় এবার সপ্তঋষির আশ্রমে এসে পৌঁছুলাম।

সপ্তঋষির মন্দির নতুন। সাধুদের আস্তানা হিসেবে আশেপাশে তখনও ছোট ছোট ঘর নির্মিত হচ্ছে। মন্দিরের বারান্দার চার দিকে সপ্তঋষির ছবি। গৌতম ভরদ্বাজ ইত্যাদি করে সাতজন মুনি। সাতজন মুনি বা ঋষির ছবি দেখলাম বটে, কিন্তু রক্তমাংসের জীবন্ত কোন ঋষি দেখলাম না। অথচ রক্তমাংসের সেই সাধুসন্তের দেখা পাবার জন্যই ঘর থেকে বেরিয়েছি। কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটেই শুধু সৌভাগ্যবশতঃ এক মহাশক্তিধর সাধকের দেখা পেয়েছিলাম। এ পর্যন্ত আর কোন সাধকের সাক্ষাৎ পাইনি। সপ্তধারা ও সপ্তঋষির আশ্রমেও যথার্থ সাধুসন্তের দেখা পেলাম না।

সপ্তঋষির আশ্রম দেখা শেষ হলেও বেলা অনেক ছিল। আজকেই কনখল দেখে নেব ঠিক করেছিলাম। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে সে ভাবেই কথা হয়েছিল। সুতরাং কনখল লক্ষ্য করে রিক্সা ফিরতে লাগল। ফেরার পথে চলতে চলতেই পথের মধ্যে মান সিংহের ছত্রী, নীলপর্বত, কুশাবর্ত, শুকনাথ মহাদেবের মন্দির, বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির, মায়াপুর, এইসব জায়গা দেখালো রিক্সাওয়ালা, অবশেষে এসে থামল কন্‌খলে।

ভারতবর্ষে মহাশাক্তপীঠের উদ্ভব কন্‌খলে। এই কন্‌খলেই ছিল দক্ষের প্রাসাদ। দক্ষকন্যা সতী পিতার অনিচ্ছায় বিবাহ করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবকে। দক্ষযজ্ঞে পতির নিন্দা শুনে সতী এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। সেই দেহ স্কন্ধে শিব সারাভারতব্যাপী নৃত্য করেছিলেন।

বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয়ে সতীর দেহ ভারতের একান্নটি বা বাহান্নটি স্থানে পড়েছিল। সেই থেকেই ভারতে একান্নটি বা বাহান্নটি মহাশক্তিপীঠের উদ্ভব, যে শাক্তপীঠের অন্যতম একটি পীঠ আমাদের কালীঘাটের মন্দির। এই কালীঘাটের মন্দির প্রাঙ্গণে অনেক সময়ই শক্তিধর সাধকের, আবির্ভাব হয় শুনেছি। তাহলে মহাশাক্তপীঠের উদ্ভব যে স্থান থেকে সেখানে কি যথার্থ কোন সাধকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবেনা? কেমন একটা বিশ্বাস জন্মাল; নিশ্চয়ই দেখা পাওয়া যাবে।

কন্‌খলের মন্দির প্রাঙ্গণে পা দিতেই ইতিহাসের ছায়া ফেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি লাইন মনের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল:

'কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র! কোথা কন্‌খল,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবন চঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটি ভঙ্গী করি অবহেলা
যেন পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জ্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল॥'

কন্‌খল মন্দির প্রাঙ্গণের উপর বিরাট একটি কড়ি জাতীয় গাছ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সুদূর অতীত থেকে ইতিহাসের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে সে। প্রাচীন ছোট ছোট ইটে গাঁথা দেয়ালেও বহু প্রাচীনকালের সাক্ষী। কেন যেন হৃদয়ের মধ্যে একটা ইতিহাসের স্পর্শ অনুভব করলাম। যে স্থানে দক্ষ মহাযজ্ঞ করেছিলেন তার উপর মন্দির উঠেছে। প্রথম ঢুকলাম মন্দিরে। মন্দিরে মায়ের মূর্তি, ফুল বেলপাতার স্তূপ। যুগ যুগান্তরের বিশ্বাস অঙ্গে মেখে মূর্তি যেন জীবন্ত। যুগের পর যুগ অগণিত দর্শক এখানে এসে তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছে।

আমি পুজো দিতে আসিনি, এসেছি দেখতে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মূর্তির প্রতি আমার বিশ্বাস কম। মূর্তিকে আমি একটা প্রতীক বলে ভাবি মাত্র। মূর্তির এই প্রতীকার্থ ভক্তজনেরা জানে না, বিশ্বাস করে না। তারা মূর্তিকে যথার্থ ও সত্য বলেই মানে।

তাদের এই বিশ্বাস কোন প্রতিদান পায় কিনা—কে জানে! আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কথাই ভাবলাম। আমার মত পার্থিব জীব যারা, তাদের কাছে এর কোন সহজ জবাব নেই। জবাব পেলাম না। ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম।

গঙ্গার একটি ক্ষীণধারা গেছে কন্‌খলের পাশ দিয়ে। অনেকেরই বিশ্বাস নীলগঙ্গার ধারা আর ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল এখানেই। ছোট ছোট মাছেরা জলের নিচে খেলা করছে স্পষ্ট দেখা যায়। পুণ্যার্থীরা অনেকেই এখানে পিণ্ড দিচ্ছে। সেজন্য ঘাটের ধারে অনেক পাণ্ডা বসে আছে। একজন পাণ্ডা আমাকে ধরল পিণ্ড দেবার জন্য।

আগে আত্মা সম্পর্কে বিশ্বাসে আমার দ্বিধা ছিল। বিজ্ঞানের একটি সমীক্ষা আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী গাছের একটি পাতা কেটে শক্তিশালী ক্যামেরা দিয়ে আশ্চর্য জিনিষ দেখতে পেয়েছেন। অর্ধেক পাতার পূর্ণ নিগেটিভ উঠছে। কি করে এটা সম্ভব! বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, স্থূলদেহের ঊর্ধ্বেও একটা সূক্ষ্ম দেহ আছে। চর্মচক্ষে সে দৃশ্য দেখা না গেলেও শক্তিশালী ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ে। তাঁদের এই পরীক্ষা বিজ্ঞানী মহলকে যেমন ভাবিয়ে তুলেছে, ভাবিয়ে তুলেছে আমাদেরও। ভারতের অধ্যাত্ম সাধকেরা দেহের যে ষড়কোষের কথা বলেছেন, সে সম্পর্কেও এখন আমাদের নতুন ভাবনা দেখা দিয়েছে।

আমার এক বন্ধুর মুখে আমি পিণ্ড সম্পর্কে আশ্চর্য এক কাহিনী শুনেছিলাম। তাঁর এক সহকর্মী বন্ধু গিয়েছিলেন বেড়াতে। পুষ্কর তীর্থে যাবার পর পাণ্ডারা তাঁকে ধরে পিণ্ড দেবার জন্য। ভদ্রলোক আত্মায় বিশ্বাসী নন, সুতরাং পিণ্ড দেবার তাঁর কাছে কোন অর্থই নেই। কিন্তু পাণ্ডা বারবার পেড়াপিড়ি করতে লাগল। এজন্য এক পয়সাও দিতে হবে না, এমন কথাও বলল। ভদ্রলোকের কি মনে হল, তিনি রাজী হলেন। কিন্তু বালুকা প্রান্তরে পিণ্ড দিতে গিয়ে বিচিত্র ব্যাপার! ভদ্রলোক পিণ্ড দিতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন, তৃষ্ণার্ত পূর্বপুরুষেরা

সার বেঁধে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা দেখার পরই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তারপর কলকাতায় ফিরে আসার পর তাঁর মাথায় গোলমাল দেখা দেয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর ভাল হন।

সুতরাং পূর্ণ বিশ্বাস হোক বা না হোক, আমি কিন্তু পিণ্ড দিলাম। আমার চোখে পূর্বপুরুষদের কোন ছায়াপাত ঘটল না। পিণ্ড দিয়ে উপরে উঠলাম। ঘাট থেকে উপরে উঠলেই একটি গাছ, গাছের গোড়ায় বৃত্তাকার বাঁধানো বেদী। সেই বেদীর উপর রক্তাম্বর পরিহিত কৃষ্ণশ্মশ্রু-গোঁফ, স্থূলবপু এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। দু'এক পয়সা যে যা দিচ্ছেন, তারই বিনিময়ে চরণামৃত দিচ্ছেন। আটআনা পয়সা দিয়ে আমিও চরণামৃত নিলাম। সন্ন্যাসী স্পষ্ট বাংলায় আমাকে বললেন, বাবা, বার-বছর এই গাছের নিচে আছি। যে-যা দেন, তাতেই চলে যায়। নিত্য-দিনের যা আহার্য প্রয়োজন, তা মিটে যাবার পর উদ্‌বৃত্ত পয়সা মন্দিরে দিয়ে দিই। বেশ ভাল আছি।

সন্ন্যাসীর চেহারা সুন্দর, সৌম্য, কিন্তু তবু বোধহয় আমার হৃদয়ের অন্তপুরে তিনি সাড়া তুলতে পারলেন না। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম ঃ—হরিদ্বারে আসা তক ঘুরছি, জানেন, কিন্তু কোন সন্ন্যাসী চোখে পড়ল না।

তিনি বোধহয় একটু মর্মাহত হলেন। স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমাকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, বাবা, যথার্থ সাধু দেখলে তুমি চিনতে পারবে? তোমার আশেপাশে এখানেই যে অনেক সাধু নেই, তুমি বুঝবে কি করে?

বললাম, সাধু দেখলে তাঁর মুখ চোখ দেখেই চিনতে পারব।

সন্ন্যাসীটি বললেন, বাবা, সাধু চেনা অত সহজ নয়। বারবছর এক নাগারে এই গাছের নিচে আছি, সাধু চিনতে পারিনি। সাধু চিনতে হলে সেজন্য নিজেকে তৈরি করতে হয়। তিনি ওধারে একটি জীর্ণ ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে দেখ একজন লোক বসে রয়েছেন। কাছে গেলে তাড়া করে আসবেন। অথচ উনি খুবই একজন

বড় সাধক। গিয়ে দেখ সাধু চিনতে পার কিনা। সাবধান পয়সা-টয়সা দিওনা যেন।

এগিয়ে গেলাম ঘরটির দিকে। কতকালের ঘর কে জানে। ছোট ছোট ইটের তিরি, উপর থেকে সব পলেস্তারা খসে পড়েছে। জীর্ণ ঘরের দেহে অনেক আগাছা গজিয়েছে। ঘরের মেঝেতে ইঁদুর-তোলা মাটি, ছোট ছোট ঢিবিতে ভর্তি। তার মধ্যে কুঞ্চিতচর্ম একটি লোক বসে বসে পাগলের মত ছেঁড়া কাপড় কুটিকুটি করে ছিঁড়ছে। বয়সের ভারে এতই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ঘরের দুয়ারের কাছে একটু দূরে দাঁড়াতেই তিনি আমার দিকে তাকালেন। অদ্ভুত চোখ দুটি। এত তীব্র জ্যোতি সেখানে যে, মনে হয় লক্ষসূর্য একত্র জ্বলছে। সে চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে। আমি আর একটু এগিয়ে যেতে চাইলাম। তিনি হাত তুলে বারণ করলেন। তাঁর চোখের এত জ্যোতি সত্ত্বেও আমার মনে হল লোকটি পাগল। গাছের নিচে বসা বাঙ্গালী সাধুটি বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি পয়সা নেন না। আমার মনের মধ্যে একটা কৌতূহল জাগল। পয়সা দিয়ে এঁকে পরীক্ষা করতে হবে। সেই জন্য পকেটে হাত দিলাম। এক টাকার একটা কয়েন ছিল, মুঠি করে ধরে হাত বাইরে আনলাম। লোকটি বোধহয় বুঝতে পারল। তাই ইশারায় বলল, টাকাটা ছুঁড়ে দাও, এগিও না। আমি কয়েনটা ছুঁড়ে দিলাম। তারপর ফিরে এলাম সেই গাছ-তলায় বসা বাঙ্গালী সাধুটির কাছে। উনি বললেন, সাধু দেখলে ?

—হ্যাঁ।

—কি মনে হয় ? সাধু ?

বললাম, আমার মনে হয় পাগল।

বাঙ্গালী সন্ন্যাসীটি হাসলেন, সংসারে যথার্থ পাগল যে কে, বিচার করা কঠিন বাবা। ভগবান যাঁদের কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা পাগলাটে ধরনের, কারণ তাঁদের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে ওঁদের জীবনযাত্রার মান খাপ খায় না, অথবা মানুষের

স্মৃতিতে এঁরাই বেঁচে থাকেন। গতানুগতিকভাব পথে যাঁরা চলেন তাঁরা কেউ বেঁচে থাকেন না।

বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর এই উক্তি শুনে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের সেই পাগলা সন্ন্যাসীটির কথা আমাব মনে পড়ল। পাগল সম্পর্কে তাঁরও উক্তি এই ধরনের।

আমি বাঙ্গালী সাধুটিকে বললাম, আপনি বলেছিলেন উনি পয়সা নেন না, কিন্তু আমি পয়সা দিয়েছি।

অবাক হয়ে সন্ন্যাসীটি বললেন, উনি পয়সা নিয়েছেন ?

—হ্যাঁ।

—নিয়েছেন !

—হ্যাঁ।

খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন সন্ন্যাসীটি, তারপর বললেন, তোমার বহু ভাগ্যি বাবা। আজ পর্যন্ত কারো কাছ থেকে ওঁকে পয়সা নিতে দেখিনি।

দিনের আলো নিস্তেজ হয়ে আসছিল। কন্‌খলের মন্দিরের আঙিনা জুড়ে ছায়া দিয়ে যে বিরাট মহীরুহগুলি দাঁড়িয়ে আছে তার ডাল-পালা অসংখ্য পোক পাখালির আশ্রয়। রোদে দিন শেষের গন্ধ ফুটে উঠতেই তারা সব দলে দলে নিজবাসে ফিরে আসছিল। বিহগকাকুলি ফুটে উঠছিল তীর্থপুণ্যপ্রয়াসীদের কলকণ্ঠ ছাপিয়ে। বাইরে আমার রিক্সাওয়ালা ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছিল, অর্থাৎ আমাকে এবার ফেরার জন্য তাগিদ দিচ্ছিল।

কন্‌খলের মন্দিরে ঢোকার পথে গেট, গেটের গা ঘেঁষে রাস্তা। রাস্তার ওপাশে মনোহারী দোকান। আমি গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম : দেখি সেই জীর্ণ ঘরের ততোধিক জীর্ণ সাধুটি বাইরে মনোহারী দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে, কি একটা কিনছেন। সম্ভবতঃ গাঁজা। তাঁর দেহের ত্বকে তখন বিন্দুমাত্র কুঞ্চনের চিহ্ন নেই। সটান ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। চোখের

দীপ্তিতে যেন আরও কয়েকটা সূর্য এসে জড় হয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে এমন অট্টহাসিতে হেসে উঠলেন সাধুটি যে, সেই হাসির ঢেউ লেগে আমার বুকের ভেতর কলজেটা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। কেন জানিনা, শ্রাবণের মেঘের মত একটা ভারি ছায়া আমাকে ছেয়ে ফেলল। অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে আমি রিক্সায় উঠলাম। রিক্সা চলতে লাগল—কিন্তু আমার বিমর্ষ ভাব থেকে কিছুতেই যেন অব্যাহতি পেলাম না। বুঝলাম, সাধু চেনা যথার্থই কষ্টসাধ্য কাজ।

সেদিন ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা আর কোথাও বেরুনো গেল না। কোথাও বেরুবার যেন বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হল না। শরীর ক্লান্ত হয়েছিল বলে যে এমনতর, তা নয়। আসলে কী এক অব্যক্ত বিষাদ আমাকে চেপে ধরেছিল। ব্রহ্মকুণ্ডে হর-কি-পৌড়িতে আরতি দেখতেও বেরুলাম না। বেরুলাম পরদিন ভোরবেলা।

ভোরে ব্রহ্মকুণ্ডের চতুর্ধারে অন্য দৃশ্য। দূরে হিমালয়ের রেখা দেখে মনে হয় এইমাত্র তপস্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। শিশিরস্নাত হরিদ্বারকে দেখে মনে হয় সব যেন অমৃতস্নাত। কী যে একটা অব্যক্ত পবিত্রতার ছোঁয়া পাওয়া যায় তখন, সে কথা বলে বা লিখে বোঝানো যায় না। এই বিশেষ ধরনের পবিত্রতাই তার বৈশিষ্ট্য। সেই পবিত্র সকালের স্পর্শ নিতে নিতে কলোচ্ছ্বাস গঙ্গার বাঁধানো তট দিয়ে হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম অনেকটা উপরের দিকে, হঠাৎ একটা করতালির শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। করতালির সঙ্কেতটা যেন আমাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, কে আমাকে ডাকছে। বাঁ ধারে উদ্ভিদ ও গুল্মের মধ্যে নগ্নগাত্র এক সাধু দেখলাম। মাথার চুল পাকা। মুখভর্তি পাকা গোঁফদাড়ি। চোখ দুটি অত্যন্ত করুণ। আমার সঙ্গে চোখে চোখে হতেই আমাকে হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন। ভাবলাম, ভিক্ষে চায়। ভিক্ষের জন্যে এদেশের মানুষ কত ভেক্ ধরে! কেউ খোলকরতাল নিয়ে কীর্তন গায়, কেউ খমক একতারা নিয়ে বাউল সঙ্গীত করে, কেউ বা গেরুয়াবাস পরে। এ লোকটিও বোধহয় সেইরকম।

অক্টোবরের হরিদ্বারের নির্মম শীত উপেক্ষা করে সে প্রায় নগ্ন গাত্রে বসে আছে। ভিক্ষের জন্য কী কসরৎ! এই ধরনের ভণ্ডদের দেখলে আমার ভারি রাগ হয়। আমি এঁদের উপেক্ষা করে চলি। কিন্তু এক্ষেত্রে কি হল, একটি গভীর কৌতূহল জন্মালো আমার। আমি এক পা দু'পা করে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে।

সন্ন্যাসীটি মৌন আছেন বোঝা গেল। কথা বললেন না। আমি কাছে যেতেই শ্লেটে খড়ি মাটি দিয়ে লিখলেন—(যা খুঁজছিস, তা তোর ভেতরেই আছে। বাইরে তাকে পাবি না। তবে এখনো সময় হয়নি। সময় হলে এমনিই সব হবে। সাধু দেখলেই কি সাধু হওয়া যায়? তা যদি হত তাহলে বই পড়লেও সাধু হওয়া যেত। বাইরের জল হাওয়া দরকার বটে, তবে বীজ যদি অন্তঃসারশূন্য হয় তাহলে যতই জল ঢালো না কেন, গাছ গজাবে না।) তোর মধ্যে বীজ আছে, সময় মত বৃষ্টি পড়বে।

অবাক হয়ে লাইন কয়টি পড়ে আমি ভাবতে লাগলাম। সত্য আমার লক্ষ্য বটে, তবে অধ্যাত্মসত্যপিয়াসী সাধকের মতই কি আমার সেই সত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসা? অন্ততঃ আমার আমাকে যতটুকু জানি—তাতে এত গভীর আমাকে মনে হয়নি। আমার সত্য সাধনা পুঁথি পুস্তকের মাধ্যমে, সাধু সন্তের মাধ্যমে, নিজের মধ্যে নয়। এবং তা নয় বলেই নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করি। আমার নিজস্ব ধ্যান ধারণা প্রমাণের জন্য তর্কের অবতারণা করি। তর্কে জয়লাভ করলে পরিতৃপ্ত বোধ করি। মুখে বলি বটে, সত্যকে জানা যায় না, সত্য হতে হয়, কার্যতঃ সত্য হবার চেষ্টা করি না। নিজেকে জানাই সবচেয়ে দুরূহ কাজ। শাস্ত্রমতে নিজেকে জানলেই সব কিছু জানা যায়। উপনিষৎ এই কারণেই বলেছে—আত্মানং বিদ্ধি। বাউলেরা বলেছে, 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে কয় মানুষ রতন'। সেই মানুষ রতনের বীজ আমার মধ্যে আছে এ বোধ আমার মনে এখনও আসেনি।

সাধুটির লেখা পড়ে তাঁকে বললাম, ভেতরের বীজ তো বাইরের আলো হাওয়া জল পেলেই বেড়ে উঠে! তা যদি হয় তাহলে সাধু সন্ত খুঁজলে কি ভুল হবে?

একটু হাসলেন সাধুটি। আবার শ্লেটে খড়ি মাটি দিয়ে লিখলেন —শীতের আকাশে বর্ষার মেঘ খুঁজলে কি পাওয়া যাবে?

খুব মনোযোগ দিয়ে লাইনটি পড়ে, আমি এর যথার্থ অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম। শীতের আকাশে বর্ষার মেঘ কি? অর্থাৎ অসময়ের মেঘ? অর্থাৎ সাধুটি বলতে চাচ্ছেন যে, শীতের আকাশে যেমন বর্ষার মেঘ খুঁজলে পাওয়া যাবেনা, তেমনি আমি যদি এখন, অর্থাৎ আমার অসময়ে সাধুসন্ত খোঁজ করি, তা পাওয়া যাবেনা! অর্থাৎ আমার এই অভিযাত্রা নিস্ফল! বললাম, কখনও কখনও শীতের আকাশেও তো বর্ষার মেঘ দেখা যায়?

সাধুটি শ্লেটে আবার লিখলেন, সে মেঘে বৃষ্টি হলেও শস্য জন্মায় না।

মনটা আমার একটু বিমর্ষ হল। জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে কবে সেই বর্ষার মেঘ আমার ভেতর দেখা দেবে?

সাধুটি শ্লেটে লিখলেন, বর্ষাকালে।

—আমার বর্ষাকাল কখন?

উনি শ্লেটে লিখলেন, পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ।

—পঞ্চাশ বছর বয়স হবার পর আমাকে বনে যেতে হবে?

সাধুটি হেসে আবার শ্লেটের উপর খড়ি মাটি ধরলেন, পঞ্চাশের উপর বয়স হলে সংসারই অরণ্য হয়ে যায়।

কথাটির তাৎপর্য বিচার করবার চেষ্টা করলাম। মনে হল, এর গভীরতর কোন অর্থ আছে। আরও কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না। তার আগেই খড়ি মাটির রেখা কাটা শ্লেটটি তিনি আমার চোখের উপর তুলে ধরলেন। দেখলাম লেখা রয়েছে— 'হৃষিকেশ লছমন ঝুলা যেতে হবে, তাড়াতাড়ি বেরুবার চেষ্টা কর।'

আশ্চর্য! মনের খবরও এ সাধুটি রাখেন, বোঝা গেল। জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনার নাম কি?

শ্লেটের উল্টোদিকে নিজের নাম দেখিয়ে দিলেন তিনি। খড়ি মাটিতে স্পষ্ট লেখা: বাঙ্গালী বাবা।

জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কবে দেখা হবে?

শ্লেটে লিখে দিলেন, যখন সময় হবে। এখন যা।

কিন্তু তবু যেন যেতে ইচ্ছে করছে না। আর একটি প্রশ্ন করতে গেলাম। দেখলাম, শ্লেটটা পড়ে রয়েছে, সাধু নেই। চারদিকে তন্ন তন্ন করে চোখের দৃষ্টি দিয়ে খুঁজেও তাঁর দেখা পেলাম না।

নটা নাগাদ ধরমশালা থেকে বেরুলাম। এলাম ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে। প্রাইভেট কার সদৃশ্য এই সব ট্যাক্সি চুক্তি করে হরিদ্বার লছমনঝুলা দেখায়। তাদের একজনের সঙ্গে রফা করে নিলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম হৃষিকেশ আর লছমনঝুলার দিকে। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশের দূরত্ব চোদ্দ মাইল। লছমনঝুলা সতের।

গাড়ি ছাড়তে দেরী করল না। গাড়ি চলল পাহাড়ের আঙিনা দিয়ে ধূসর মাটির বুকে, মেটালিক রাজপথে। সামনে হিমালয়ের কোল। এই দূর অপরিচিত দেশের পারিপার্শ্বিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে চললাম। এ দৃশ্য তাকিয়ে দেখলে চোখে নেশার ঘোর অনুভব করা যায়। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় জেলা শহরের রেখা নজরে পড়ে। বাঁধানো পথ সেখানেও উঠে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধূসর ধূলির পথ ছাড়িয়ে গাড়ি ঢুকল অরণ্যের ছায়ার নিচে। পথে একটা ছোট শহর ছাড়ালাম। কিছুক্ষণ পরে হৃষিকেশও ছাড়িয়ে গেলাম। হৃষিকেশ দেখব ফেরার পথে। এবার গাড়ি গিয়ে উঠল পাহাড়ের কোলে। এবার দু'পাশে উন্নত অরণ্যবৃক্ষ। দার্জিলিংয়ের পথে শিলগুড়ি ছাড়িয়ে হিমালয়ের কোলের অরণ্যের সঙ্গে এ অরণ্যের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দার্জিলিংয়ের পথের মত এ পথ ক্রমশঃ এঁকেবেঁকে হিমালয়ে উঠে

যায়নি। পাহাড়ের একটা উদ্‌বৃত্ত অংশ ছাড়িয়ে এ পথ নেমেছে আবার সমতলভূমিতে। পাহাড়ের উপর থেকে ডান দিকে গঙ্গার প্রবহমান ধারা দেখা যায়। তার গা ঘেঁষেই ঘন অরণ্যাবৃত পাহাড়ের সবুজ ছাউনী। দূরে বাঁ দিকে পাহাড়। সামনে পাহাড়। ডাইনে পাহাড়। ডাইনে পাহাড়ের গা ঘেঁষে নেমেছে গঙ্গার ধারা। অপূর্ব সেই নৈসর্গিক শোভা। সেদিক থেকে একপলকও দৃষ্টি ফেরাতে ইচ্ছে করেনা। দুই চোখ ভরে চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে নিতে লাগলাম। একটা পুলিশ ফাড়ি ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল।

এবার ক্রমশঃ রাস্তা উর্ধ্বে উঠেছে। হিমালয়ের পাদদেশ এগিয়ে আসছে কাছে। নববধূর লজ্জা কাটিয়ে হিমালয় তার সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন খুলে দিচ্ছে। এমন নিবিড় সৌন্দর্যের আকর্ষণ আমাকে আগে কখনও টানতে পারেনি। অবশেষে পাহাড়ের বিশেষ একটা ধারে গাড়ি এসে থামল। অনেক গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে প্রবাহিনী গঙ্গার নীল জলরাশি। ওপারে পাহাড়ের গায় গীতা ভবন। অপূর্ব দৃশ্য।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে রাস্তা আরও এগিয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ও পথ গেছে বদ্রীনাথে। এখন বাসে করেই বদ্রীনাথে যাওয়া যায়। সামনে গভীর গিরিখাতে প্রবাহিত লছমনঝুলার গঙ্গার উপর স্টীলের দড়ির সেতু দেখতে পেলাম। এই দড়ির ঝুলন্ত সেতু পার হয়ে কত যুগ যুগান্তর ধরে তীর্থ যাত্রীরা গেছে মহাপ্রস্থানের পথে অনন্ত পুণ্যার্জনের আশায়।

গাড়িওয়ালা বলল, বাবুজী এবার ওপারে যান। ঘুরুন, ফিরুন, দেখুন। বিকেল তিনটে নাগাদ আবার গাড়ি নিয়ে আসব।

আমি বললাম, এত সময় লাগবে ?

গাড়িওয়ালা হেসে বলল, বাবু, এখানে দেখার শেষ নেই। যান, এগিয়ে যান।

সামনেই ঝুলা। যেন একখণ্ড বিদ্যুৎ শাশ্বত অনির্বাণ দীপ্তিতে

জ্বলছে। কথা বলা ভুলে গেলাম। দৌড়ে ছুটে গেলাম ঝুলার দিকে। নিচে গভীর গিরিখাতে সুনীল প্রবহমান গঙ্গা। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বুঝলাম, হাওড়া ব্রীজের নির্মাণকৌশল দিয়ে এ ব্রীজ তৈরী। হাওড়া ব্রীজ যদি একটা হাতী, লছমনঝুলা তবে একটা হরিণ শিশু। অঙ্গ ভরে অদ্ভুত একটা বিদ্যুৎরেখার চমক। ঝুলার উপর উঠে দু'পা এগুতেই অনুভব করলাম, ঝুলাটা দুলছে। ঝুলন্ত সেতু এবং তা এইভাবে দোলে বলেই এর নাম ঝুলা। মাঝখানে উঠে নিচে তাকালে ভয় করে। সেই কত নিচে গঙ্গা! পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না। নিচে তাকালে মাথা ঘোরে। যখন দড়ির ঝুলা ছিল তখন না জানি কত মারাত্মক ছিল এই পথ। অথচ এই দুর্গম পথকেও পুণ্যার্জনের আশায় কত শত সহস্র যাত্রী অবহেলায় অতিক্রম করেছে। সেই ভয়াবহ ঝুলার উপর দিয়ে চলতে বেশ অন্য ধরনের একটা আনন্দ ছিল, যা এখন আর অনুভব করা যায় না।

সৌন্দর্যের আহ্বান সৌন্দর্যপিয়াসীদের কাছে আলাদা। ভয়ঙ্করের মধ্যেও তাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে পান। যোগী সাধক সরোজকুমার লাহিড়ীর মুখে এ সৌন্দর্য প্রীতির এক অপূর্ব গল্প শুনেছি। যাঁর কথা একটু পরেই আমি বলব। কিছু লোকজন নিয়ে শ্রীরামপুরের কাছে তিনি গঙ্গা পার হচ্ছেন। নতুন খেয়ার মাঝি। গঙ্গার বান সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই। নৌকো কিছুদূর এগুতেই বোঝা গেল বান আসছে। তখন আর তীরে ভেড়ার উপায় নেই। বানের ঢেউ তাহলে আছড়ে মেরে দেবে। সুতরাং বানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাঝ নদীতেই নৌকো রেখে দেওয়া হলো। যাত্রীরা নৌকোর পাটাতনে শুয়ে পড়ল —যাতে বানের দোলায় ছিট্‌কে না পড়ে। একজন যাত্রী ঘোড়ায় চড়ার মত নৌকোর গলুইয়ে দুইদিকে পা ঝুলিয়ে বসে রইলেন। মুহূর্তের মধ্যে বান এসে গেল পাহাড়ের চূড়ার মত ঢেউ তুলে। তার চূড়ায় ফসফরাসের ফেনপুঞ্জ জ্বল জ্বল করছে। কী এক যাদুবলে নৌকোটা যেন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল। তারপর আছড়ে পড়ল

গিরিখাতের মত গভীর নিচে। এইভাবে আছাড়িপিছাড়ি চলল অনেকক্ষণ। এক অলৌকিক শক্তিবলে নৌকোটা বেঁচে গেল। কী আশ্চর্য! যে যাত্রীটি নৌকোর গলুইতে বসে ছিলেন, তিনি বান স্থির হতেই শুধুমাত্র একটি কথাই বললেন, **Dangerous beauty.**

সৌন্দর্যের আকর্ষণ দুর্দ্দমনীয়। সত্যের আকর্ষণও তেমনি। তার কারণ, যা সত্য তাইই সুন্দর। এইজন্যই **Keats** বলেছিলেন, **Beauty is Truth, Truth is Beauty.**

কেদারনাথ বদ্রীনাথ তো শুধুমাত্র সত্যের মোক্ষধাম নয়, সৌন্দর্যেরও মোক্ষধাম। সেই সত্যসুন্দরের আকর্ষণেই যুগ যুগ বিপদকে তুচ্ছ করে এ পথের উপর দিয়ে পুণ্যার্থীরা হিমালয়ের আঙিনা দিয়ে মহাপ্রস্থানের দিকে এগিয়ে গেছেন।

শোনা যায়, তীর্থপুণ্যযাত্রীদের বিপদের আশঙ্কা দূর করার জন্য এক শেঠনন্দন এই স্টীলের ঝুলন্ত ব্রীজ তৈরী করে দিয়েছিলেন। তাঁর মায়ের নির্দেশেই তিনি এই ঝুলা তৈরী করেছিলেন।

ঝুলার উপর দাঁড়িয়ে বার কয়েক নিচে তাকিয়ে দেখলাম। আর কখনও দেখা হবে কিনা কে জানে! খড়ি ওড়ানো দেহ ও নুড়ির মত চুল নিয়ে স্থানীয় মেয়েরা ঝুলার উপর ময়দার গুলি বিক্রী করছে। যাত্রীদের অনুরোধ করছে গুলি কিনে নদীর বুকে ছুঁড়ে দিতে। মাছে খাবে। কয়েক পয়সার গুলি কিনে ঝুলার একপাশে দাঁড়িয়ে নদীর বুকে একটা একটা করে ছাড়তে লাগলাম। স্তব্ধ নদীর বুকে বড় বড় মাছের মুখ ভেসে উঠতে লাগল। একটা গুলির জন্য না হোক একশটা মাছের ভিড় জমছে। তাদের রঙিন আঁশটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। সত্যিই বিচিত্র এই দেশ, বিচিত্র এই দেশের সৌন্দর্য। কবি যথার্থ ই বলেছিলেন, 'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।'

একটা একটা করে গুলিগুলো শেষ করে ঝুলা থেকে নামলাম। ওপারে কাঁকর বিছানো পথ। পাশে কলস্বনা গঙ্গা নিচে প্রবহমান।

ওধারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে বস্তী। দু'একটি পাকা ঘর। পাকা ঘরগুলি সবই মন্দির বা সাধকদের থাকবার ঘর। পাশেই রাম সীতা লক্ষ্মণের মন্দির। প্রথম সে দিকে না গিয়ে হাঁটতে লাগলাম পয়দলের পথে হিমালয়ের উর্ধ্ব-আঙ্গিনার দিকে।

নীলাঞ্জনা অলকানন্দা মসৃণ ভাবে পাহাড়ের গা কেটে গিরি খাত তৈরী করেছে। স্বপ্নের রঙ্ বুকে নিয়ে অলকানন্দা বয়ে চলেছে নিচের দিকে। এ পারে অরণ্যের কোল দিয়ে স্বল্প পথযাত্রী লাঞ্ছিত পয়দলের পথ। মহাপ্রস্থানের পথে এই হল প্রাচীন পথ। ওপারে পাহাড়ের গা দিয়ে আধুনিক মেটালিক রাস্তা। লরি, বাস, প্রাইভেট কার চলেছে। উভয় পথই গেছে বদ্রীনাথের দিকে। অসীম সৌন্দর্য আঁচল বিছিয়ে বসে আছে পথের দু'ধারে। নিবিড় বনানীর ইশারা আরও সামনে। সামনে কি যেন একটা চুম্বক আছে যা মনকে টেনে নিতে চায়। চলতে চলতে পথের বাঁ ধারে বাঁধানো ঘাটের মত কি নজরে পড়ল। একজন দেহাতী লোককে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, এ হল চটি।

'চটি' শব্দটি শুনে বুকের মধ্যে কেমন এক অব্যক্ত শিহরণ অনুভব করলাম। চটি, অর্থাৎ তীর্থপথযাত্রীদের বিশ্রামাগার। কত শতলক্ষ তীর্থপুণ্যযাত্রীর চরণধূলো লেগে আছে এর অঙ্গে। কত ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস, কত মোক্ষধামে পৌছুবার স্বপ্ন। চটির বুকে দাঁড়িয়ে প্রবাহিনী গঙ্গার জলস্রোত দেখা যায়, কলধ্বনি শোনা যায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে স্নানের ব্যবস্থা আছে। পেছনে নিবিড় অরণ্যের ছায়া, সামনে স্বপ্নের নীল স্রোত। এই চটিতে দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে চোখ ভাসিয়ে নিজের বুকের মধ্যে এক অব্যক্ত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। চটির গায়ে অজস্র নাম লেখা। কোনটা খড়ি মাটির, পুছে পুছে গেছে। যারা একটু স্থায়ীভাবে নিজের নাম রাখতে চায় তারা নুড়ি দিয়ে ঘষে ঘষে নাম লিখেছে। নিজেকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করার মানুষের কী নিবিড় আকাঙ্ক্ষা!

আশ্চর্য ! দেহের ক্লান্তি থাকলেও মনের যেন কোন ক্লান্তি নেই। উর্ণনাভের মত সে কল্পনার জাল বুনে চলেছে। নীল নীল ঢেউ তুলে নীল অলকানন্দা পাহাড়ের একটা বাঁক থেকে বেরিয়ে চটির সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে। কোন্ মহান শিল্পী যে তাঁর তুলির টানে এমন জীবন্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন কে বলবে ! ভাবলাম, বাঁকের আড়ালে গিরিখাতে গঙ্গা অপরূপ রূপ নিয়েছে। সে কথা মনে হতেই চটি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে দিলাম।

বৃক্ষশ্রেণীর নিবিড় ছায়াভরা পথ। পথ চলে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে অনেক দূর। মাঝে মাঝেই জড়াজড়ি করা কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ী ঘর। গরু শুয়র চড়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। ছায়া ঢাকা এ পথে লোক চলেছে খুব কম। যেন কোন মহান অধ্যাত্ম সত্য অনুভব করে এ পথ নীরব হয়ে আছে। শুধুমাত্র একান্তে কান পেতে দিলে বহু তীর্থযাত্রীর চরণ সম্পাত মুখর হয়ে উঠতে চায়। মানস নেত্রে ভেসে উঠে মহাপ্রস্থানের পথে শত শত পুণ্যার্থীর নীরব মিছিল।

ক্রমশঃ অরণ্য ঘন হয়ে এসেছে লছমন ঝুলার উত্তরদিকে। এই দুর্গম ও নির্জন বনপথে চলার কী রোমাঞ্চ ! মনে মনে ভাবতে লাগলাম, আমি যদি সেই অতীত তীর্থযাত্রীদের সহযাত্রী হতে পারতাম !

আপন মনে এগিয়ে চলেছি। মহামৌনী প্রকৃতি যেন পরম সিদ্ধ সাধকের মত ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছে এখানে। কোন অলৌকিক শক্তিধর সাধকের প্রয়োজন নেই। একা নীরবে এ পথের ধারে বসে থাকলে প্রকৃতিই বোধ হয় বুকের গভীর অন্তঃপুর থেকে হৃদয়ে লুকানো পরম সত্যকে টেনে উপরে তুলে নিয়ে আসবে। বহুদূর সমুদ্রের একটা নীরব গর্জন অনুভব করা যায় যেন এ পথে। কেন যে এরকম হয় কে জানে ! কবি সমর সেনের কবিতার কয়েকটি লাইন অকারণেই মনে পড়ে গেল :

'অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ—
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দু'ধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপর ঝরুক মহুয়ার ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।'

কবিতার লাইন কয়টি মনের মধ্যে ছন্দে ছন্দে দুলাতে দুলাতে এগিয়ে চললাম। কোথায়, কতদূরে হিমালয়ের কোন্ শিখরে বদ্রীনাথের পরম ধাম রয়েছে, সে-কথা ভাবতে লাগলাম। তীর্থযাত্রীদের মুখে শুনেছি, অলকাপুরীর সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বদ্রীনাথ ধাম। অধ্যাত্মতায় সে সৌন্দর্য এত মহান যে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শক্তিধর বহু সাধকেরও সেখানে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এমন এক শক্তিধর সাধকের বদ্রীনাথে যিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁর নিজের মুখ থেকে গল্প শুনেছি।

বদ্রীনাথ ধামে এক শক্তিধর সাধকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সঙ্গীত বিশারদ সাধকগায়ক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। একসময় অধ্যাত্ম জীবনের আকর্ষণে তিনিও পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলামের তিনি ছিলেন অনুজ সুরকার। তাঁহ বহু গানের তিনি সুর দিয়েছেন। নজরুল ও সিদ্ধেশ্বর উভয়েই অধ্যাত্ম সত্যের আকর্ষণে আসক্ত ছিলেন। নজরুলকে আকর্ষণ করেছিলেন বিখ্যাত যোগী বরদাচরণ মজুমদার। ছায়াদেহে তিনি নজরুলকে গাড়ীর মধ্যে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও সাক্ষাৎ ও করুণা পেয়েছিলেন বহু সিদ্ধ সাধকের। এর মধ্যে বদ্রীনাথের এক অজ্ঞাত যোগী এবং তন্ত্রসাধক তারাক্ষেপা ছিলেন অন্যতম।

বদ্রীনাথে তীর্থপুণ্য অর্জন করতে গিয়েছেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। প্রচণ্ড শীতে প্রথম রাত্রি পাণ্ডার আতিথেয়তায় কাটাবার পর পরদিন

সকালেই উন্মুক্ত প্রকৃতির নিচে বদ্রীনাথ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। দেখছেন মন্দিরের দুই পাশে বরফের স্তর মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সু উচ্চ পর্বত মালা। শ্বেতশুভ্র বরফের স্তূপ আপন অন্তর্নিহিত জ্যোতি বিকিরণ করে যেন চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে রেখেছে। দক্ষিণে 'নারায়ণ' পর্বত, বাঁয়ে 'নর' পর্বত। নর ও নারায়ণের মধ্যে স্থাপিত বদ্রীনাথের মন্দির, অর্থাৎ স্থূল জগৎ ও সূক্ষ্ম জগতের মিলন স্থল। রাণী অহল্যাবাঈ নির্মিত মন্দির। পাশেই পাথরের তৈরী নাটমন্দির। স্বর্ণখচিত চূড়ায় রক্তপতাকা। নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে বিগ্রহ দর্শন করলেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা নারায়ণ। নারায়ণ বৈরাগী শিব নন, লক্ষ্মীপতি। সুতরাং জাঁকজমক যথেষ্ট। মণিমুক্তাখচিত বেদী ও উপঢৌকনের আড়ালে তিনি যেন চাপা পড়ে আছেন। মন্দিরের দেবতা দর্শন করলেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। তারপর পূজোর তোড়জোর করলেন। মন্দিরের কাছেই আছে, তপ্ত খণ্ড, নারদ কুণ্ড ও প্রহ্লাদ ধারা, ঋষি গঙ্গা ও উরুমধারা। পূজোর আগে এই পঞ্চতীর্থের জলে স্নান করে নিতে হয়। সিদ্ধেশ্বর বাবু স্নান করে নিলেন। এখানে রয়েছে ব্রহ্মার কপাল। এই কপালে পিতৃপুরুষ ও নারায়ণের ভোগের পিণ্ড দিতে হয়। সিদ্ধেশ্বরবাবু ভোগ দিলেন। তরাপর হোম ও অন্যান্য তীর্থকর্ম সেরে মন্দিরে ঢুকে নারায়ণ দর্শন করে পূজো দিলেন। মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছে, 'জয় বদ্রি বিশাল লাল কি জয়।' সে জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি দেবতা প্রণাম করলেন।

বদ্রীনাথের উত্তরে মানাপাশ, আরও উত্তরে শতপন্থি। মহাপ্রস্থানের পথে পাণ্ডবেরা এখানেই স্বর্গমর্ত্ত্যের সঙ্গমস্থলের সাক্ষাৎ লাভ করে-ছিলেন। সেই দিকে তাকিয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবু কোন মহাশক্তিধর সাধকের সাক্ষাৎ কামনা করতে লাগলেন। লোকমুখে শুনেছিলেন কাছেই এখানে একটি গুহায় একজন শক্তিধর সাধক থাকেন। পথের খোঁজ নিয়ে তিনি সেই গুহার ধারে গেলেন। একজন নগ্নগাত্র

সন্ন্যাসী সেই গুহায় ধ্যাননিমিলিত নেত্রে বসে আছেন। কয়েকজন ধনী মারোয়ারী তাঁর সামনে মিষ্টি রেখে বসে আছেন। কিন্তু সন্ন্যাসী চোখ মেলে তাকাচ্ছেন না। অনেকক্ষণ পরে মারোয়ারী পুঙ্গবেরা চলে গেলে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। পাশে একজন স্থানীয় লোক ছিল, তাকে ইশারায় বললেন, 'খাবারগুলো নিয়ে যা, জলদি নিয়ে যা।' ভাবখানা এমন, যেন একটা ঘৃণিত দৃশ্যের সামনে থেকে মুক্ত হতে পারলে তিনি বাঁচেন।

খাবারটা সরে গেলে তিনি যেন পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সিদ্ধেশ্বর বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, সব পাপী, বুঝলে, সব পাপী।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, বাবা, দয়া করে আমায় বলুন।

সন্ন্যাসী বললেন, রাতে আয়, তোকে বলব।

অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধানে সিদ্ধেশ্বরবাবু তখন সত্যিই ব্যাকুল।

তিনি সারা দিন কোন রকমে রাস্তায় কাটিয়ে রাত দশটা নাগাদ আবার সেই গুহার কাছে এলেন। অভুক্ত অবস্থায় এলেন।

হিমবিজড়িত রাত যেন ঘন কুয়াশার মত পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে। শীতের ক্ষুরধার আক্রমণে সিদ্ধেশ্বরবাবু ব্যতিব্যস্ত। কোন রকমে গুহায় ঢুকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করলেন। ক্ষীণ একটা প্রদীপ জ্বলছে গুহার ভেতর। নগ্নগাত্র সন্ন্যাসী নির্বিকার বসে আছেন। সিদ্ধেরবাবুকে দেখে ডাকলেন, আয়, খানা পিনা করে এসেছিস?

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, না।

—সে কি! খাসনি-কেন?

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, আপনার কাছে এসেছি, খাবার মিলবে জানি।

—আমার কাছে কি খাবার মিলবে রে। আমি যে দীন সন্ন্যাসী!

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছা হলে আপনি কি না করতে পারেন?

সন্ন্যাসী একটু হাসলেন। তারপর দুই দিকে ফাঁকা, ভাঙা একটি কেনেস্তারা টিনে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে গরম পুরি তরকারির একটি পাত্র বের করে বললেন, এই নে, খা।

কেবল যেন উনান থেকে নামানো হয়েছে এমন গরম। সিদ্ধেশ্বর-বাবু খেয়ে পরম পরিতৃপ্তি বোধ করলেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি চাস ?

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, আমার বাবা ভয়ানক অসুস্থ। তিনি আর কতদিন বাঁচবেন ?

সন্ন্যাসী একটু চোখ বুজে থেকে বললেন, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে গেছে। তবে চেষ্টা করলে এক বছর বাঁচিয়ে রাখা যায়।

—কি করতে হবে ?

সন্ন্যাসী বললেন, এক বছর তুই দাঁড়ি গোঁফ কামাবি না, তবে বাঁচবে।

আশ্চর্য ! সত্যি সত্যি সিদ্ধেশ্বরবাবু একবছর দাঁড়ি গোঁফ কামাননি। তাঁর বাবাও এক বছর বেঁচে ছিলেন। ঠিক একবছর পরে তিনি মারা যান।

সাধকের অলৌকিক ক্ষমতার তিনি আমাকে আর একটা গল্প বলেছিলেন। তাঁর মতে Transplantation of Life সম্ভব। তিনি নিজে নাকি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন বিখ্যাত তন্ত্রসাধক তারাক্ষেপা। বোধহয় কোন এক বিধবার সন্তান মারা গেছে। তিনি কেঁদে পড়েছেন তারাক্ষেপার কাছে। তন্ত্র-সাধকের করুণা হয়েছে। তিনি বলেছেন, যা, বেঁচে উঠবে। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তিনি এক অসাধ্য কাজ করলেন। একটা সজীব গাছের ডাল ধরে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে গাছটা শুকিয়ে যেতে লাগল। যেন তড়িৎ পীড়িত হয়েছে। গাছটা শুকাতে শুকাতে একেবারে মরে গেল। বিধবার সন্তান বেঁচে উঠল। অর্থাৎ গাছের জীবন তুলে নিয়ে তিনি মানুষকে দিলেন।

এই অলৌকিক শক্তির রহস্য কোথায়, আমার ইচ্ছা সেই গোপন তথ্য জানা। সেই সত্যের সন্ধানেই আমার এই ছোট্ট অভিযাত্রা। এই অভিযাত্রায় আমি তুটি শক্তিধর সাধকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। এক কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে আর এক কন্‌খলে। কিন্তু তুটিই পাগলাটে ধরনের। আলোচনা করে তাঁদের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা অর্থহীন। বাঁ দিকে অলকানন্দাকে রেখে পায়দলের পথে হেঁটে যেতে যেতে বার বার আমি উত্তুঙ্গ হিমালয় শীর্ষের দিকে তাকাতে লাগলাম: এমন কোন শক্তিধর সাধকের সঙ্গে কি আমার সাক্ষাৎ হবে না? কিন্তু বাঙ্গালী বাবার কথা মনে পড়তে কেমন যেন বিষন্ন হয়ে গেলাম। তখনও নাকি আমার সময় হয়নি।

হিমালয়ের পথের আকর্ষণ সীমাহীন। সামনের দিকে এগুতে থাকলে শুধুই মনে হয় চরৈবেতি। কিন্তু তবু এক সময় আমাকে ফিরতে হল। সময় আমার ঘড়িতে বাঁধা। চারটের মধ্যে আমাকে ফিরতে হবে, গীতা ভবনের ওপারে গাড়ির স্ট্যাণ্ডে। আমার গাড়ি সেখানে অপেক্ষা করবে। সুতরাং ফিরতে লাগলাম। ফেরার পথে লছমন ঝুলার ব্রীজের পাশে মন্দির দেখে এলাম। লক্ষ্মীজীর মন্দির। মন্দিরে রয়েছে লক্ষ্মীজী ও ধ্রুবের মূর্তি। কাছাকাছি ছোট একটা গুহা মন্দির। সেখানে দেখলাম ভারতীয় গিরিক বসন পরা একজন আমেরিকান মহিলাকে। হিমালয়ের নির্জন প্রান্তরে তিনি একটি মন্দির তৈরি করছেন। ঐশ্বর্যের বিলাস ছেড়ে কিসের জন্য এই মহিলা এই নির্জন পাহাড়ের গুহা ও চূড়ো বেছে নিয়েছেন সে কথা ভাবতে লাগলাম। সমগ্র পৃথিবী ঐশ্বর্য ও সম্ভোগের জন্য পাগল। সেই ঐশ্বর্য ও সম্ভোগের সন্ধান পেয়েও এই মহিলা কেন হিমালয়ের এই নির্জন স্থান বেছে নিয়েছেন? তাহলে ঐশ্বর্যেও কি শান্তি নেই? সম্ভোগে পরিতৃপ্তি নেই? যথার্থই বোধ হয় তাই। জীবনে কোন কিছুতেই পরিতৃপ্তি নেই। তা যদি হত তাহলে মানুষ সুখী হতে পারত। যে বাড়ি চায়, সে বাড়ি পেলে গাড়ি চায়। যে গাড়ি পায় সে প্রতি-

পত্তি চায়। যে প্রতিপত্তি পায় সে আরও ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষা করে। ভাগ্যিস এই পৃথিবীতে সর্বজয়ী কেউ হতে পারেননি ! তা যদি পারতেন তাহলে বোঝা যেত, এতে তিনি সন্তুষ্ট কি না। ভারতবর্ষ বলেছে, পরিতৃপ্তি আছে অনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে। গৌতমবুদ্ধ এই জন্য নির্বাণের কথা বলেছেন, যেখানে আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। জীবনে সর্বআশা আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করে দিতে পারলেই একমাত্র পরিতৃপ্তি। আর সে-ই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন কাজ। আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়ান হওয়া সম্ভব, কিন্তু বামাক্ষেপা তৈলঙ্গস্বামী হওয়া সাধারণ মানুষের ক্ষমতার অসাধ্য। মানুষ বহুদূর আকাশের নক্ষত্রকে তাকিয়ে দেখতে পারে কিন্তু আপন মনের গহন অভ্যন্তরে তাকাবার ক্ষমতা তার নেই। সেখানে যে ডুব দিতে পারে জীবনে সে-ই পরিতৃপ্ত। এই মহিলাটি বোধ হয় মনের গহনে—ডুব দেবার জন্যই নির্জন স্থান বেছে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এই, নির্জন পার্বত্য অরণ্য, তুষারকীরিট পর্বতমালা কি আমেরিকাতে নেই ? তবে সেই আমেরিকা ছেড়ে ভদ্রমহিলা ভারতে কেন ? বোধহয় স্থান মাহাত্ম্য বলে কিছু একটা আছে। ভারত-অনুরাগীরা বলেন, —ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মের দেশ। বিচার করলে দেখা যায়, কথাটা মিথ্যে নয়। ইতিহাসের অনেক আগে থেকে ভারবর্ষে একটা অধ্যাত্ম চিন্তার ধারা বয়ে চলেছে। মহেন-জো-দড়ো হরপ্পার শিল্প চর্চা করলে সেখানে যে অধ্যাত্ম সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আর্যরা ভারতে এসে সেই অধ্যাত্ম সাধনার ধারাকে নষ্ট করতে পরেননি। তারপর আর্য-অনার্যের সম্মিলিত চেষ্টায় সেই অধ্যাত্ম সাধনার ধারা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তা অমর হয়ে টিকে আছে। শকহূনদল পাঠানমোগল ইংরেজ কেউ ভারতের সেই অধ্যাত্ম সত্যকে নষ্ট করতে পারেনি। মুসলমানরা যেখানে গিয়েছে সেই সব দেশ যেমন, মিশর, মধ্য এশিয়া, ইরাণ প্রভৃতি, কয়েক বছরের মধ্যে তাদের ধর্ম হারিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ছ'শ বছরের উপরে ভারতের মাটিতে নানা ভাবে থেকে মুসলমানরা এদেশের ধর্ম নাশ করতে পারেনি। যথার্থই এ ধর্ম সনাতন ধর্ম।

স্থান মাহাত্ম্যেই এ-ধর্ম অমর। মালদহের আম অন্য মাটিতে মালদহের মত ফলে না। ভারতে যে ধর্ম চিন্তা সম্ভব, অন্যত্র বোধ হয় তা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের ধর্মই অন্তরাত্মায় ডুব দিতে শিখিয়েছে। হিমালয়ের মহান গাম্ভীর্য অন্তরের গভীর গহনে ডুব দিতে সাহায্য করেছে। সেই জন্য যুগের পর যুগ ধরে মহাযোগী ঋষিপুরুষেরা হিমালয়ের গুহাকন্দরকে তাঁদের সাধনার স্থল করে নিয়েছেন। সেই স্থান-মাহাত্ম্যের জন্যই বোধহয় আমেরিকান মহিলা সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের হিমালয় অঙ্গনে এসেছেন।

আমেরিকান মহিলার কথা চিন্তা করা বাদ দিয়ে আবার পা বাড়ালাম। লক্ষ্মীজীর মন্দির ছাড়িয়ে পথ গেছে ফেরিঘাটের দিকে, যেখানে রয়েছে গীতাভবন। গীতাভবন দর্শন করে ঘাট পার হয়ে হৃষিকেশ। হৃষিকেশ দর্শন শেষ করে ফিরব হরিদ্বার।

লক্ষ্মীজীর মন্দির থেকে গীতাভবন কমপক্ষে মাইলখানেক পথ। সমস্ত.পথটাই নিবিড় পত্রছায়ায় ঢাকা। কিন্তু অরণ্য যেন এখানে সুসজ্জিতা। যেন মজঃফরপুরের কোন জমিদার আম বাগান তৈরী করেছেন। পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট ঘর। সাধু সন্ন্যাসীদের থাকবার জায়গা। ভাবলাম, ঘরের মোহ ছেড়েও সীমার বন্ধন এইসব সাধুসন্তরা কাটাতে পারেন নি। ঘর ছেড়ে বেরুলেই হয় না, মনে অসীমের স্পর্শ চাই। গৈরিক বসন পরলেই হয় না, মনে বৈরাগ্যের ছোঁয়া নেই। ভগবানের ভরসায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মানুষের কাছে পয়সা ভিক্ষা চাইছে। ভগবানের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে বসে থাকতে পারেনি।

অরণ্যপথ, ভিক্ষুক, সাধু, সব অতিক্রম করে হাঁটতে লাগলাম। এইসব ভিখারী, সাধুসন্ত, সব ছেড়ে অরণ্য এখানে প্রকৃতির বিপুল দান নিয়ে বিরাজমান। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে অনির্বচনীয় এক আনন্দ উপভোগ করা যায়। চলতে চলতে বার বার কেন যেন অভিজ্ঞান শকুন্তলম এর কণ্বমুনির আশ্রমের কথা মনে পড়তে লাগল।

অরণ্যের নিবিড় ছায়া কাটিয়ে অবশেষে সামনে একটা আশ্রম দেখতে পাওয়া গেল। আশ্রমের প্লেটে নাম লেখা—বাবা কালী কমলীওয়ালার আশ্রম। তীর্থ যাত্রীদের শ্রম লাঘবের জন্য বাবা কালী কমলিওয়ালা এরকম আরো অনেক আশ্রম স্থাপন করেছেন। কালো একটা কম্বল গায় জড়িয়ে রাখতেন বলে এঁর নাম হয়েছিল কালী কমলিওয়ালা। অতিথিদের থাকবার জন্য এখানে ধরমশালা আছে। অনেক বাঙালী পরিবারকে দেখলাম হরিদ্বার ছেড়ে এই কমলীওয়ালার আশ্রমে এসে আছেন। ভিড় এখানে কম। অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ অনেকটা বেশি করে অনুভব করা যায়। এই ধরমশালার অতিথিরা হয়তো যথার্থই ধর্মকর্ম করতে এসেছেন বলে হরিদ্বার ছেড়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়ে আছেন।

আশ্রমের প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে চারদিক নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলাম। পাহাড়ের এইরকম পরিবেশে চিরদিনই আমি বিশেষ একটা আকর্ষণ বোধ করি। মন যখন ক্লান্ত তখন অনেক দিন সমুদ্রের স্বপ্ন দেখেছি আমি। ভেবেছি দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের ধারে বেলাভূমিতে শুয়ে থাকলে বোধহয় এ ক্লান্তি যাবে। কিন্তু পুরীর সমুদ্রের ধারে দুদিন থাকবার পরই ক্লান্তি এল। দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের গর্জন, বেলাভূমি, কিছুই আমার মনকে তেমন করে টানতে পারল না। কিন্তু দার্জিলিং-এ মহাকালের মন্দির প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হিমালয়ের তুষারকীরিট চূড়ার দিকে তাকিয়ে মনে আমার মুহূর্তের জন্যও ক্লান্তি আসেনি। কেন যে এমন হয়, এর ব্যাখ্যা আমার মন করতে পারবে না। ছোটবেলা পাহাড়ের কোলে মানুষ হয়েছি বলেই হয়তো পাহাড়কে আমার এত ভাল লাগে।

কালী কমলীওয়ালার আশ্রম ছাড়িয়ে গীতাভবন। গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেসের ধনী মারোয়ারীরা এই গীতাভবন তৈরি করেছেন। গঙ্গার ধারে মনোরম এই অট্টালিকা। সাধু সন্ন্যাসীরা এখানে আসেন, থাকেন। বহু সাধুসন্ত ও তীর্থযাত্রীর চরণধূলিতে এই ভবন ধন্য।

কিন্তু ভবনের প্রতি আমি কোন আকর্ষণ বোধ করলাম না। প্রকৃতির কোলে এখানে যে গীতার সারমর্ম রয়েছে, সেটাই সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করবার ব্যাপার। বাইরে এসে প্রবহমান গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। কোন্ সুদূর হিমালয়শৃঙ্গ থেকে গঙ্গা তার ধারা বহন করে নিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের এ এক মহান প্রাণসঞ্জিবনী ধারা। এর পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতায় আমি বিশ্বাস করিনা। গঙ্গার জলকে পবিত্র বলে ঘরে রেখে দেবার কথাও কদাচিৎ আমার মনে আসে। তবে উত্তর ভারতের এই সীমান্ত অঞ্চলে গঙ্গার এই ছবি দেখলে মনের ভিতর অধ্যাত্মতার কেমন একটা স্বাদ অনুভব করা যায়। শুধু মনে হয়, আছে, আছে, আছে। কি আছে, কোথায় আছে, বুঝতে পারিনা। আমাদের সচেতন মনের বোঝার উর্ধেও কিছু একটা আছে। সেই 'কিছু একটা'র যথার্থ সন্ধান দিতে পারে এমন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়াই দুষ্কর। গীতা ভবনের ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অতীত ভারতের অধ্যাত্ম তপোবনের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। সাধুসন্তের পোশাক পরা অনেক লোক দেখলাম। কিন্তু কোন মুখেই সত্যের স্পর্শে উজ্জীবিত ঔজ্জ্বল্য দেখলাম না।

মন যদি একবার ছড়িয়ে যায়, প্রকৃতিতে, আকাশে, বাতাসে, সেখান থেকে ফিরতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সংসার জীবনের সব কিছুইতো ঘড়ির কাঁটায় হিসেব করা। সুতবাং মন চাইলেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ওপারে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকবে, সুতরাং ঠিক সময় মত নদী পার হয়ে ওপারে হৃষিকেশ যেতে হবে। সুতরাং গীতাভবন থেকে আবার বাবা কালী কমলীওয়ালার আশ্রমে ফিরে সেখান থেকে ঘাটে এসে ফেরী ধরলাম। অনেকেই দেখি ঘাটের পাশে আধুনিক রেস্তোরাতে খাবার খাচ্ছে। অধ্যাত্ম চেতনা ও শিল্পবোধ, কোনটাই যে এদের নেই বোঝা যায়। বৃদ্ধাকে তরুণীর সাজে সাজালে তাকে আরো কুশ্রী দেখায়। বৃদ্ধ যদি যুবকের মত নক্সা করা চকমকি পাঞ্জাবী পরেন তাঁকে হতকুৎসিত দেখায়। অধ্যাত্ম প্রকৃতির মুখে এই ধরনের

অত্যাধুনিক রেস্তোরাঁও তেমনি বেমানান। এই সব হোটেল রেস্তোরাঁর নেশায় যারা ভ্রমণে বেরোন তাঁরাও তীর্থক্ষেত্রে বেমানান মানুষ। তীর্থস্থানের পবিত্রতাকে তারা ধর্ষণ করেন তাঁদের ব্যবহারে ও নোংরা মনের ছোঁয়ায়। আমি আশা করেছিলাম হিমালয়ের তুলনামূলক ভাবে এই নির্জন পাদদেশে কিছু সাধুসন্তের দেখা পাব। কিন্তু তার বদলে কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবকযুবতী দেখতে পেলাম। এদের ভয়েই হয় তো সাধুসন্তরা এসব স্থান থেকে দূরে সরে গেছেন।

নীল গঙ্গার স্রোত পার হয়ে ওপারে গেলাম। কার পার্কে গাছের ছায়ায় আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে গঙ্গার ধারে রেলিং-ঘেরা কিছুটা জায়গা আছে, সেই রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে ওপারে গীতাভবন ও কালী কমলীওয়ালার আশ্রমের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। উত্তরে সুবিশাল হিমালয়ের দিকেও তাকালাম। অতিলৌকিক সম্পদ রয়েছে এখানেই। তাই দেখতেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় মাপা সময়ে অসীমকে তো ধরা যায় না। তাই সামান্য একটু ইঙ্গিত পেলেও পেলাম না, যা জানতে বেরিয়েছিলাম তাকে। বিষণ্ণ মনে গাড়িতে উঠলাম। ফেরার পথে হৃষিকেশ আশ্রমে গাড়ি একটু থামল। ঐতিহ্যমণ্ডিত একটা অধ্যাত্মতার গন্ধ এখানে রয়েছে। সৌন্দর্যও অফুরান। প্রকৃতিও অকৃপণ। অনেকটাই পেলাম, তবু শূন্যতাটাই যেন বিরাট হয়ে বুকের মধ্যে গেঁথে রইল। সেই মহান গম্ভীর ব্যক্তির কোন সাক্ষাৎ পেলাম না, যাঁকে দেখলেই নির্দ্বিধায় বলে ওঠা যায়, ইনি শাশ্বত ভারতের অন্তরাত্মার প্রতীক। যাঁকে দেখলেই বলা যায়, হ্যাঁ, এই সেই লোক যাঁকে দেখতে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি।

যখন হরিদ্বারে ফিরলাম, সন্ধ্যা তখন তার নিবিড় ছায়ার আঁচল ছড়িয়ে দিয়েছে হরিদ্বারের উপর। ধরমশালায় ফিরতে ইচ্ছে হল না। ধরমশালা তো গৃহ নয়, পথ চলতে বিশ্রামের একটু অবসর মাত্র। আমি পথে বেরিয়েছি পথের আনন্দ কুড়াতে। সুতরাং বিশ্রামকন্দরে না ঢুকে উন্মুক্ত প্রকৃতির নিচেই রইলাম। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম

ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে। সন্ধ্যাবেলা হরিদ্বার এখানেই ভেঙ্গে পড়ে। কেউ ভেঙ্গে পড়ে হুজুগে, কেউ রঙ তামাসা দেখতে। কেউ ব্রহ্মকুণ্ডে হর-কি-পৌড়িতে আরতি দেখতে। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ভিড় জমে উঠেছে ব্রহ্মকুণ্ডের চারদিকে। আর কিছুকাল পরেই হর-কি-পৌড়িতে আরতি শুরু হবে। আমি ওধারে গিয়ে কলকল্লোলিনী গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে জল ছুঁই ছুঁই করে বসলাম। উন্মত্ত স্রোতপ্রবাহে গঙ্গা কল কল খল খল শব্দ তুলে ছুটে চলেছে।

আপন মনে বসে আমি ভাবছি। হঠাৎ নজরে পড়ল ওধারে ক্লক-টাউয়ারের কাছে একটি দেহাতী লোক কাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখলাম, একজন তরুণ সাধক, কম্বল গায়। রাজপুত্রের মত চেহারা। ভেতর থেকে সত্যকে জানার সেই অন্ধ তাগিদ আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঠেলে পাঠাল। একটু উঠে সাধুর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। হাসি হাসি মুখ, দেহে একটা দীপ্তি আছে। প্রণাম করে কাছে বসলাম। সাধুটি কিছু বললেন না। শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে হাসতে লাগলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, সাধুজী আমায় কিছু বলুন।

সাধুজী হাসতে হাসতেই বললেন, কিয়া বলেঙ্গে। আপন অন্তরকো শোচ। অর্থাৎ উপনিষদের সেই কথা, আত্মানং বিদ্ধি।

বললাম, কিয়া শোচেঙ্গে সাধুজী? কই জবাব নেই মিলতে।

সাধুজী বললেন, জবাব মিলতে, কই কি, বাহার নেই আতে।

—বাহার নেই আতে কাহে?

—তুম না দেয়াল তুল দিয়া।

—হাম কাহা দেয়াল দিয়া?

—দিয়া। বাসনা কামনাকো দেয়াল দিয়া। দেয়াল ফেক্ দেও, জবাব হরকত মিলতে রহি।

—উ দেয়াল কেইসে তোড় দেঙ্গে?

—আপনা অন্তর দেখতে রহো, উ আপসে তোড় যায়েঙ্গে।

—আপনা অন্তরকো কেইসি দেখ রহে ?

সাধুজী বললেন, ধ্যান সে। নিদিধ্যাসন সে।

—কই মন্ত্রভি তো চাই ?

—কইভি নেহি। চুপচাপ বৈঠা রহো। ভ্রূযুগলমে জ্যোতি ভাব। আপসে উ মিল যায়েঙ্গে। অন্তরকা জবাব আপসে আ যায়েঙ্গে।

জিজ্ঞাসা করলাম, মেরা কুছ হোগা ই লাইন মে ?

—কাহে নেই হোগা। জরুর হোগা। সব কই কো হোগা। হোনা তো চাহি জরুর। পরমাত্মা না এহি দুনিয়া হুয়া ! হামভি পরমাত্মা হায়, তুমভি। তব্ হোগা কাহে নেই ?

মুক্তি যে প্রত্যেকেরই হবে, সাধুজী এ বিষয়ে আমাকে একটা তত্ত্ব বললেন। যে তত্ত্বের বাংলা তর্জমায় অর্থ দাঁড়ায় এই : সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মাণের মধ্যে যখন অহং বোধ হয় তখনই তাঁর মধ্যে ইচ্ছার একটি কেন্দ্র তৈরী হয় বিন্দুর আকারে। এই বিন্দুই শক্তি। এই বিন্দু তখন ছড়িয়ে পড়ে ব্রহ্মাণেরই মধ্যে আলোর তরঙ্গে। এই তরঙ্গ ধাপে ধাপে ছড়াতে থাকে। আলো ছড়াতে ছড়াতে তারই মধ্যে সৃষ্টি হয় সৃষ্টির উপাদান, আমরা যাকে বলি বস্তু। বস্তুর অনির্বচনীয় উপাদান এই বিন্দুর মধ্যেই থাকে প্রথম। তরঙ্গের আকারে সেই বিন্দু ছড়াতে ছড়াতে ক্রমশ ঘনীভূত হয়। জ্যোতি দেখা দেয় বস্তুকণা আকারে। তারপর সেই বস্তুকণার পারস্পরিক সংমিশ্রণে একের পর এক সৃষ্টি ফুটে উঠতে থাকে। প্রত্যেকটি বস্তুকণার মধ্যেই পরমাত্মন বা ব্রহ্মাণ থাকেন। 'এক' ব্রহ্মাণের মধ্যে বস্তুকণা যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্বে ফুটে উঠে তখন ব্রহ্মাণের সর্বব্যাপী চেতনা সৃষ্টির নানা অস্তিত্বের আবরণের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। সেই ব্রহ্মাণস্বরূপ বুঝতে গেলে বিপরীত গতিতে অগ্রসর হতে হয়। অর্থাৎ যেখান থেকে উৎপত্তি সেই উৎসের দিকে চেতনাকে ঠেলে পাঠাতে হয়। যে স্তরে স্তরে বস্তুপুঞ্জের উদ্ভব, সেই স্তরে স্তরে ফিরে গেলে আবার যেখান থেকে উৎপত্তি তার সন্ধান পাওয়া যায়। সৃষ্টিবর্ণনায় এই গুহ্য তত্ত্ব রয়েছে মানুষের দেহের মধ্যেই। এই মানুষের

মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্মাণের অহংবোধরূপ জ্ঞানকেন্দ্র-'বিন্দু'। যে বিন্দুই ইচ্ছার প্রথম সঞ্চার। সেই বিন্দু আছে মানুষের ব্রহ্মরন্ধ্রে। সেখান থেকে তার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে পড়তে বস্তুরূপে ঘনীভূত হয়ে আছে গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলের মাঝামাঝি কোন স্থানে। পরমা শক্তি সেখানে স্থির হয়ে আছে। তার অজ্ঞাত চৌম্বক ক্ষমতায় দেহ-মহাবিশ্ব গতি লাভ করছে, সক্রিয় থাকছে। তার প্রতিচ্ছায়া নিম্নাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই স্থির হয়ে যাওয়া ঘনীভূত শক্তিকে জাগ্রত করলে যে ভাবে সে স্তরে স্তরে ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নে নেমে এসেছে, সেই ভাবে স্তরে স্তরে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। সেই শক্তিই কুণ্ডলিনী শক্তি। তাঁর ঊর্ধ্বগতিতে ছটি প্রতিবন্ধক আছে। এই প্রতিবন্ধকই ছটি চক্র। এই ছটি চক্র ভেদ করে শক্তি যদি আবার সেই ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পরম অস্তিত্বরূপ কেন্দ্রে গিয়ে মিলতে পারে তাহলেই সত্যের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়, সত্য হওয়া যায়।

সাধুর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার বাংলার বাউলদের গানের কথা মনে পড়ে গেল। এই দেহকে বিরাট মূল্য দিয়ে তারা দেহতত্ত্বের গান রচনা করেছে। মানুষের এই দেহের মধ্যে মানুষ-রতনের কথা বলেছে, বারবার হাহাকার করে বলেছে, কোন স্থানে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। মানুষের মধ্যেই রয়েছে সত্য, সেই সত্যকে হারিয়ে আমরা দেশবিদেশে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াই। এই জন্যই বাউলেরা এই ধরনের গান বেঁধেছে ঃ

কোথায় পাব তারে—
আমার মনের মানুষ যেরে,
হারায়ে সেই মানুষে দেশবিদেশে
খুঁজে বেড়াই অন্ধকারে॥

এতদিন এসব গান হেঁয়ালী বলে মনে হত আমার। অকস্মাৎ হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে বসে সেই বাউলগানের অপূর্ব তাৎপর্য যেন আমার কাছে ধরা পড়ল। বাউলেরা যে বারে বারে গুরুর কথা বলেছে সেই গুরুর অর্থও ধরা পড়ল। এই গুরু ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পরম অস্তিত্ব।

সাধুকে বললাম, এই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগানো যাবে কি ভাবে?

হাসতে হাসতে সাধুজী বললেন, হাম তেরা গুরু নেহী।

—কিন্তু……

আমাকে বেশি বলতে দিলেন না তিনি। থামিয়ে দিয়ে কয়েকটি কথা বললেন। যা বললেন তার মূল কথা এই, সময় না হলে কি গাছে ফুল ফোটে? অর্থাৎ তিনি যা বলতে চাইলেন তার মানে—আমার দেহবৃক্ষে ফুল ফোটে নি, ফুটলে গন্ধে মৌমাছি আসবেই, অর্থাৎ গুরু আসবে।

সাধুজীর কথার মধ্যে কি যাদু আছে, কে জানে! সমস্ত দেহের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ খেলে যায়। দেহবৃক্ষে ফুল না ফোটার জন্য আমার কেমন যেন বেদনা বোধ হল। ইচ্ছে হল সাধুজীর সঙ্গে আর একটু কথা বলি, কিন্তু বলার সুযোগ পেলাম না। দেখি আকাশের বুকে বিন্দু বিন্দু তারা ফুটে উঠার মত বেশ লোক জমে উঠেছে সাধুজীর চারপাশে। সুতরাং মন খুলে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। নানা জনে নানা প্রশ্ন করতে লাগল সাধুজীকে। হাসি মুখে সবারই উত্তর দিতে লাগলেন তিনি। তারপর একসময় উঠে দাঁড়ালেন। সপ্তধারার দিকে লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলেন। আমি পেছনে পেছনে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। তারপর অকস্মাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সামনে কেউ নেই। কেমন একটা ভার ভার বোধ করলাম মনের মধ্যে। একটা আকুলতা বোধ করলাম নিজের ভেতরে। এই দেহের মধ্যে কোথায় রয়েছে কুণ্ডলিনী—তাঁর স্বরূপ কি ভাবে জানা যাবে, সেই জন্যই কেমন অস্থির বোধ করলাম। কতদিন এই কুণ্ডলিনী শক্তির খোঁজ করতে হবে, কে জানে! কবে দেহবৃক্ষে ফুল ফুটবে, তাই বা বলবে কে!

আশ্চর্য! মানুষের জীবনে কখন যে কি পরিবর্তন আসে কে বলবে? এই ভ্রমণে বেরুবার আগে সত্য সম্পর্কে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে আমার বক্তব্য ছিল অহংকারপ্রসূত, দাম্ভিকতায় পূর্ণ। এবার যেন সত্য সম্পর্কে সত্যিই একটি আকুলতা

অনুভব করলাম। সাধুজীর সামান্য কয়টি কথা আমার ভেতরে যেন একটা ঝড় বইয়ে দিল। কতদিন অপেক্ষা করতে হবে এই কুণ্ডলিনীর জন্য কে বলবে!

হরিদ্বারের দিন শেষ। পূজোর ভিড় জমে উঠেছে পুরো দমে। কড়ার অনুযায়ী মেহেরচাঁদ ধরমশালা ছেড়ে যেতে হবে। মাথা কুঁটে মরলেও হরিদ্বারের কোন হোটেল বা ধরমশালায় স্থান পাওয়া যাবেনা। মন চাচ্ছে না হরিদ্বার ছেড়ে যেতে, তবু যেতে হবে। হরিদ্বারের প্রকৃতির ছায়ায় অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শ আছে। মনে হচ্ছে অধ্যাত্ম জগতে চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করেছেন, এমন লোককে হরিদ্বারের এই অঞ্চলেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খুঁজে দেখবার মত সময় আর সুযোগ হাতে কোথায়? সব ছেড়ে দিয়ে যদি হিমালয়ের এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো যায় তবে হয়তো সেই মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই মন কোথায়? সেই নির্ভরতা কোথায়? হিমালয়ের আঙিনায় আঙিনায় তাঁরাই ঘুরতে পারেন যাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তির উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর নির্ভয়ে নির্ভর করতে পারেন; যাঁরা সম্পূর্ণ মনোপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেন যে, এই পার্থিব শক্তির উর্ধ্বেও শক্তি আছে। আমাদের বিশ্বাস প্রমাণ সাপেক্ষ। প্রমাণ পেলে তবেই আমরা এগুই। প্রহ্লাদ পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলেন এই পরম বিশ্বাসে যে, ভগবান তাঁকে রক্ষা করবেন। ভগবানকে না দেখেও তিনি শুধু বিশ্বাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। কেউ আমাদের ধরবার জন্যে বসে আছেন, একথা নিশ্চিত না জেনে আমরা ঝাঁপাতে পারিনা। সুতরাং সত্য আমাদের চিন্তার মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করে, অনুভবের মধ্যে সহজ সরল হয়ে ধরা দেয় না। ধরমশালায় আশ্রয় নেই, হোটেলে নেই তো কি আছে! পথ তো আছে, দাঁড়াবার মত মাটি তো আছে! কিন্তু অতদূর এগুবার ক্ষমতা আমাদের নেই। পরীক্ষায় আমরা পাশ করতে চাই, কিন্তু সারা দিন-

রাত লেখাপড়া করে নয়, মেডইজি ও শর্টকাট পড়ে। জানি না কবে এই সহজ পথে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সময় নেই, তুটো জায়গা আমার দেখা হয়নি। এক হল চণ্ডী-পাহাড় আর এক হল মনসাপাহাড়। সুতরাং শেষের দিনে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম গঙ্গার ওপারে চণ্ডীপাহাড় লক্ষ্য করে।

হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের পাশ দিয়ে তীব্র স্রোতস্বিনী যে গঙ্গা বয়ে চলেছে তা গঙ্গার স্বাভাবিক গতি নয়। বাঁধ তৈরি করে জলস্রোতকে এখান দিয়ে তীব্রগতিতে বইয়ে নেওয়া হয়েছে। মানুষের কারিগরি বুদ্ধি বোধহয় এক জায়গাতেই শিল্পের তুয়ারে চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জন করেছে, তা'হল হরিদ্বারের এই বাঁধে। এমন অপরূপ স্রোতস্বিনী বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মানুষের কারিগরি বুদ্ধি বোধহয় এমন অপরূপ অতীন্দ্রিয় মহিমা গায় মেখে আর কোথাও স্বর্গলোকের দূত হতে পারেনি। এই কৃত্রিম জলধারা পার হলেই কিছুটা ওধারে আসল গঙ্গা। তার মূল প্রবাহকে বাঁধের সাহায্যে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে এখানে জলস্রোত মন্থর। সমতলভূমিতে সাধারণ একটা নদীর মত দেখতে। কাঠের নৌকোর একটি খেয়া আছে। দেহাতী ঐতিহ্যের অনুসরণে সেখানে খেয়া পারাপার হয়। খেয়া পার হয়ে ওপারে উপলখণ্ড বিস্তৃত দীর্ঘায়তন নদীতলদেশ। বর্ষায় সম্পূর্ণ নদীতলদেশই জলের নিচে থাকে। জলের তোড় কম হলে চড়া পড়ে। এই চড়ার উপর লক্ষকোটি অসংখ্য নানাবর্ণের পাহাড়ি নুড়ি। জলের স্রোতে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে বিচিত্র আকারের উপলখণ্ডে নদীতলদেশ ভরে আছে। এই বিচিত্র রঙের নুড়ির মেলায় যে-কোন মনের মধ্যে শিশুর মত কৌতূহল জেগে ওঠে। সমুদ্রের বেলাভূমিতে ঝিনুক কুড়াবার মত, শুধু মনে হয় নুড়ি কুড়াই। কিন্তু সময় হাতে নেই। ঘড়ির কাঁটা নির্মমভাবে এগিয়ে চলেছে নিষ্ঠুর অভিভাবকের মত। শিশুর বেয়াদপি প্রার্থনায় সে কর্ণপাত করে না। ভেতর থেকে একটি বৃদ্ধ মন তাগিদ দিয়ে ওঠে, এগিয়ে চল, সময় নেই। সুতরাং নুড়ির মোহ কাটিয়ে আমাকে

এগুতে হল। হরিদ্বার যাদের অনেক বেশি সময় অনুমোদন করেছে সেই সব যাত্রীদের অনেকেই নুড়ি কুড়াবার মোহে নদীতটভূমিতেই শিশুসুলভ চপলতা দেখাতে লাগল।

চণ্ডীপাহাড় মনসাপাহাড় থেকে বেশ উঁচু। কিন্তু মনসা পাহাড়ের মত এটা ন্যাড়া নয়। মনসা পাহাড়ের মত এখানে কোন বিবর্ণতা নেই। সবুজ ঘাস, নানাবৃক্ষ, লতাপাতা সর্বত্র। বাঁ-ধারে গভীর গিরিখাতে নিবিড় অরণ্য। সেখানে হিংস্র শ্বাপদেরা ঘোরাফেরা করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হরিণ, বাঘ সবই নাকি এখানে আছে।

পাহাড়ের দিকে পথ গেছে আঁকাবাঁকা হয়ে। কখনও কখনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে পথ অকস্মাৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। লক্ষ্য সামনে রেখে সাবধানে এগুতে হয়। পাহাড়ের গা দিয়ে ঊর্ধ্বগতি পায়ে-হাঁটা পথেও জটিলতাব শেষ নেই। রীতিমত হৃদপিণ্ডেব সঙ্গে লড়াই করে চণ্ডী-পাহাড়ে উঠতে হয। অনেকেই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমার শরীর হাল্কা হবার জন্য বোধহয় বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হল না। তাছাড়া ছোটবেলা পাহাড়ের কোলে মানুষ হয়েছি বলে পাহাড়ে ওঠার অভ্যাসও আছে। নানা বাঁকা পথ ঘুরে অবশেষে চূড়ায় ওঠা গেল। শুনেছিলাম চণ্ডী পাহাড়ের চণ্ডীমন্দির একটি বিখ্যাত শাক্ত-পীঠ। ধারণা ছিল এখানে কোন শক্তিশালী সাধকের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন সাধুসন্ত নজরে পড়ল না। শুধু নানা ভক্তজনকে দেখলাম পূজোর নামে তাদের বাসনা কামনা রেখে যাচ্ছে চণ্ডীদেবীর কাছে। প্রতিমা দেখলাম, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলাম। তারপর ফেরার পথ ধরলাম।

হরিদ্বারে ফিরলাম বেলা এগারটায়। তক্ষুনি ধরমশালায় গেলাম না। এগিয়ে গেলাম মনসা পাহাড়ের দিকে। হরিদ্বারের বুকের উপরই ঝুঁকে আছে মনসা পাহাড়। খুব একটা উচ্চতা নেই। একদম নেড়া পাহাড়। পাহাড়টা যেন দীর্ঘ বিলম্বিত পর্বতশ্রেণী থেকে পৃথক। সবুজের বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই। যেন একখণ্ড বিচ্ছিন্ন ধূসর প্রস্তরখণ্ড

পড়ে আছে। অদ্ভুত কৌতূহল উদ্দীপক পাহাড়। নামের সঙ্গেও একটা সামঞ্জস্য আছে। ছোটবেলা শুনেছি, যে গাছের নিচে সাপ থাকে সে গাছ মরে যায়। বেঁচে থাকলেও তাতে ফল ফলেনা। পাহাড়টা সম্পূর্ণ নেড়া দেখে আমার মনে হল সত্যিই বোধ হয় এখানে অজস্র সাপ থাকে। সাপের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পাহাড়ের শ্যামলতা মরে গেছে।

পাহাড়টা ছোট হলেও উৎরাই বেশ কঠিন। ওঠা? চণ্ডীপাহাড়ে ওঠার চাইতেও কষ্টসাধ্য। পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির। নারকেল দিয়ে অনেকে পূজো দিচ্ছে দেখলাম। কিন্তু মা মনসার বংশধরদের অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পাহাড়ের উপর থেকে হরিদ্বার শহর-টাকে খাতার পাতায় আঁকা মানচিত্রের মত মনে হয়, কিন্তু সাধুসন্ত কেউ নেই। যে কারণে আমার অনুসন্ধিৎসা, চণ্ডী পাহাড় বা মনসা পাহাড় কোথাও আমার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হল না। বেলা বারটা নাগাদ পাহাড় থেকে নেমে ধরমশালায় ফিরে গেলাম। এবার বিশ্রাম। হরিদ্বারে আর আমার জন্য স্থান নেই। রাতের গাড়িতে কোথাও না কোথাও যেতে হবে। মনে মনে স্থির করে বেরিয়েছিলাম, হরিদ্বার থেকে যাব মথুরা বৃন্দাবন। অধ্যাত্ম সাধনায় সত্যকে জানার তিনটি পথ আছে। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা জ্ঞানের মাধ্যমে সত্যকে জানেন। তাঁরা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে মায়া বলে বর্ণনা করেন। এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণের অধিকারী। যাঁরা রজঃগুণের অধিকারী তাঁরা আত্মশক্তিতে সত্যকে জানার চেষ্টা করেন। তাঁরা সত্যের বা ব্রহ্মণের শক্তির অংশের পূজারী। তাঁরাই শাক্ত নামে অভিহিত। তাঁরা কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি শক্তির পূজা করেন। যাঁরা ভালবাসার মাধ্যমে সত্যকে জানার চেষ্টা করেন, তাঁরা বৈষ্ণব। তাঁদের উপাস্য রাধাকৃষ্ণ। সত্ত্ব-গুণের অধিকারী ও তমগুণের অধিকারী উভয়েই ভালবাসার পথে, প্রেমের পথে ঈশ্বরের সন্ধান করতে পারেন। অনুসরণের পথ হিসেবে ভালবাসার পথ, প্রেমের পথ, ভক্তির পথ সব চাইতে সহজ। যদিও

তাত্ত্বিক বিচারে অহৈতুকী ভক্তি বড় কঠিন। এ পথ সহজ-কঠিনের পথ। এ পথে মীরাবাঈ থেকে চণ্ডীদাস সিদ্ধি অর্জন করেছেন। ভক্তির পথে, প্রেমের পথে বহু সাধক ভারত বিখ্যাত। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি আন্দোলনে নবদিগন্তের সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর নির্দেশিত পথে বহু ভক্তসাধক ভারতবর্ষে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন। বৈষ্ণব মহাতীর্থ মথুরা বৃন্দাবনে আজো বহু ভক্তজনের উপস্থিতি রয়েছে। হয়তো সেখানেও সত্যের সরাসরি স্পর্শলাভে ধন্য কোন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে এই চিন্তা থেকেই মথুরা বৃন্দাবন ঘোরারও পরিকল্পনা করেছিলাম। সুতরাং ঠিক করলাম, হরিদ্বার থেকে রাত্রি-বেলা যে ট্রেন দিল্লীর দিকে ছাড়ে, সেই ট্রেনে চাপব। দিল্লী থেকে বাসে করে যাব মথুরা। তারপর বৃন্দাবন। সুতরাং আহার শেষে সারাটা দুপুর বিশ্রাম নিলাম।

পাঁচ

হরিদ্বার থেকে দিল্লীর গাড়ি ছাড়ল রাত আটটা নাগাদ। সিট রিজার্ভ করতে চেয়েছিলাম, পাইনি। সুতরাং আমার কাছ থেকে গোটা কয়েক টাকা নিয়ে T.T.C. গাড়িতে শুয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে-ছিলেন। একটা কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়ে উপরের বাঙ্কে তার কথামতই শুয়ে পড়েছিলাম। T.T.C. আমাকে অভয় দিয়েছিলেন যে, বাঙ্কে শুয়ে পড়লে যাত্রীরা আর কেউ ডিস্টার্ব করবে না।

গাড়িতে উঠলে চট করে শুয়ে পড়া আমার স্বভাব নয়। চলন্ত গাড়িতে জানালার ধারটা আমার বিশেষ পছন্দসই। দিনের বেলা প্রকৃতির আঁকা ছবি জানালার ধার দিয়ে চলে যায়। রাত্রিবেলা জ্যোৎস্না রাত হলে স্বপ্নের কানাকানি অনুভব করি। নিঃছিদ্র অন্ধকার রাত হলে মহামৌন প্রকৃতির বুক থেকে মহান সত্য আহরণের চেষ্টা

করি। ট্রেনের গতি যেন চলন্ত রেকর্ডে একটা পিন। মনের মধ্য থেকে অজস্র কথা আপনা আপনিই বেজে উঠতে থাকে। সেই আপন মনে দেখা এবং আপন মনে কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম বলে একটু দুঃখ হল। কিন্তু সারারাত বসে যাবারও উপায় নেই। দিল্লী গিয়েই যে বিশ্রাম নেব, তা নয়। সেখান থেকেও আবার দূর-পাল্লার বাসে চাপতে হবে। সুতরাং বিশ্রাম প্রয়োজন। T.T.C-র কথামত তাই একটি বাঙ্কে বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। গাড়ি ছাড়ল যথাসময়ের একটু পরে। প্রথমটা পিঞ্জরে আবদ্ধ পাখির মত আমার কল্পনা একা একা খানিকটা গুমরে মরল। তারপর একসময় বন্দী বিহঙ্গের মতই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল ভোরবেলায়। গাড়ি তখন পুরানো দিল্লীর কাছাকাছি এসে গেছে। বিছানা বেঁধেছেদে তৈরি হয়ে নিলাম। মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। পুরানো দিল্লী আর কয়েক মিনিট মাত্র। আমার লক্ষ্য মথুরা বৃন্দাবন। কিন্তু পুরানো দিল্লীতে কি কিছুই দেখার নেই! কত প্রাচীনকাল থেকে পুরানো দিল্লী ভারত-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ হয়ে আছে। এখানেই মহাকাব্যের যুগে ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। মধ্যযুগের সূচনায় তোমর রাজপুতদের রাজধানী। তারপর পৃথ্বীরাজ চৌহানের। তারপর মুসলমানদের ইতিহাসের কত হাসি কান্নার অভিনয় হয়ে গেছে এখানে। লৌকিক ইতিহাস কি শুধুই বস্তুগ্রাহ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে কি কোনই অতীন্দ্রিয় সত্যের খবর পাওয়া যায় না? সংসার কি শুধুই সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? তা যদি হয় তাহলে এই সংসারের জীবই অতিসাংসারিক অধ্যাত্ম জগতে যান কি করে? সংসারের ঘটনাই কি সংসার বন্ধন ছিন্ন করার প্রেরণা যোগায় না? আমি ইতিহাসের ছাত্র। সুতরাং অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরুলেও ইতিহাসের আকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারলাম না। ঠিক করলাম, দিল্লীতে থামব। একটা দ্রুতগতি যানে চেপে একবেলাতে দিল্লীর যতটুকু দেখা.

যায়, দেখব। তারপর অপরাহ্নে মথুরাগামী কোন বাসে চেপে সেই পরম বৈষ্ণবতীর্থের দিকে এগিয়ে যাব।

ট্রেন যখন পুরানো দিল্লীর স্টেশনে ইন করল তখন রাত্রির শেষ অন্ধকারটুকু নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সূর্য চোখ মুছে স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছে। গাড়ির ভিতরই হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছিলাম। বাইরে এসে চা আর জলখাবার খেয়ে একটি অটো রিক্সা ধরলাম। দিল্লীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়ে রিক্সা বিকেলবেলা লালকেল্লার দেয়ালের ধার থেকে আমাকে মথুরার বাসে চাপিয়ে দেবে। নেবে আশি টাকা। অটো রিক্সা প্রথম বেরুলো কুতব মিনারের দিকে। পাশে দাঁড়িয়ে রইল মধ্যযুগের বিরাট সাক্ষী সম্রাট শাজাহানের লালকেল্লা। লালকেল্লা দেখব সবার পরে। তারপর মথুরার বাস।

কেল্লার দুর্গপ্রাকার চোখে পড়ছে। লাল বেলেপাথরে তৈরি। ভেতর থেকে দু'একটি গৃহশীর্ষও নজরে পড়ছে। সু-উচ্চ কেল্লা। গাড়ি চলেছে পাশের রাস্তা দিয়ে কুতবমিনারের দিকে। কিন্তু আমার লুব্ধ দৃষ্টি বার বার কেল্লার দিকে পড়তে লাগল। মানুষের কীর্তির মধ্যেও ঈশ্বরের কোন মহান ইঙ্গিত হয়তো আছে। লালল্লো ঘুরে দেখলে তা জানা যাবে। বিরাট কেল্লা। অতিক্রম করতেই লাগল কয়েক মিনিট। অবশেষে কেল্লার নিশানাটুকু পেছনে ফেলে অটো রিক্সা এগিয়ে চলল। ইতস্ততঃ এখানে সেখানে হারানো দিনের ভগ্নাবশেষ ক্রমশঃ ক্ষীয়মান। মানুষের জীবন ও সম্পদ চিরস্থায়ী নয়, এ তারই প্রমাণ। পার্থিব জীবনের এই ট্র্যাজেডি থেকে শাশ্বত জীবনের দিকে মানুষের দৃষ্টি ফিরতে পারে। মানুষের জীবনের এই ক্ষণস্থায়িত্বই শাশ্বত সত্যের সন্ধানে মানুষকে বেশি আকুল করে তুলতে পারে। একদিন এখানে কত জাঁকজমক, প্রণয়ের দেয়ানেয়া, দুর্যোগের ঘনঘটা সব কিছু অভিনীত হয়ে গেছে। আজ সব কিছুই স্তব্ধ। মনুষ্য জীবনের সুখ দুঃখ কোনটাই চিরস্থায়ী নয়। জীবনের উর্ধ্বে যে জীবনাতীত তিনি এ-সব কিছুরই উপরে।

পুরানো দিল্লী পার হয়ে ইণ্ডিয়া গেটের ভিতর দিয়ে নতুন দিল্লী। বিরাট প্রকাণ্ড রাস্তা। মেটালিক রোড। দু'পাশে তখনও ধুলো। কাজ হচ্ছে। আরও কাজ হবে। পুরানো কীর্তিগুলোকে সরিয়ে নতুন কীর্তি গজিয়ে উঠছে। একদিন এই নতুন কীর্তিও ধ্বংস হবে। আবার নতুন কীর্তি হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না অনিত্য এই সংসার স্থায়িত্বের মধ্যে লয় পাচ্ছে ততদিন এ খেলার শেষ নেই। অথচ একেই নিত্য বলে আঁকড়ে ধরে আমরা কি ভুলই না করি। ভাঙাগড়ার এই বিচিত্র লীলা ছাড়িয়ে অটো রিক্সা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মধ্যযুগের এক অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শনের কাছে যাব—কুতবমিনার।

দিল্লী থেকে কুতবমিনার ন' দশ মাইলের মত। অধীর আগ্রহে বসে আছি। ছোটবেলা থেকে ইতিহাসের পাতায় ছবিতে দেখা কুতবমিনার এবার চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন করব। অটো রিক্সা চলতে চলতে অবশেষে এসে থামল। সামনেই কুতবমিনার। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। মানুষের এক সুমহান কীর্তি। যেন স্থাপত্যশিল্পের এক যোগীপুরুষ, সময়ের আক্রমণ উপেক্ষা করে কয়েক শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

কুতবমিনারের কাছেই কার পার্ক। কার পার্কে অটো রিক্সা থামল। কুতবের ছায়ায় সবুজ ঘাস। ছোট পার্ক। বেশ সাজানো গোছানো। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেই হবে। কারণ যাত্রী আসে দেশ-বিদেশ থেকে।

অটো রিক্সা থেকে নেমে কুতবের দিকে এগিয়ে গেলাম। এত বিশাল কুতবমিনার আগে কখনো অনুমান করতে পারিনি। যেন বিশাল হিমাদ্রী শিখরের মত গম্ভীর ও মনোরম এই বিজয়স্তম্ভ। কলকাতার ময়দানে অকটারলনি মনুমেণ্ট যেন এর কাছে শিশু। ভিত্তি থেকে উর্ধ্বে শীর্ষদেশ পর্যন্ত বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। সুন্দর কারুকার্য। কোরাণের উদ্ধৃতি। কতদিন অবহেলিত—অথচ কত গৌরব নিয়ে আজও সে বিদ্যমান।

কুতবমিনার বিজয়স্তম্ভ নয়। কুতবমিনার একজন দরবেশের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি—খোজা কুতবউদ্দীন বক্তিয়ার কাকি। বাগদাদের কাছে 'উস' নামক স্থানের অধিবাসী এই দরবেশ। হিন্দুস্থানে এসে দিল্লীর কাছে কিলগ্রীতে থাকতেন। সুলতানা ইলতুৎমিস যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এই দরবেশকে। তাঁরই সম্মানে ১২৩১-৩২ সালে তিনি এই মিনার তৈরী করেন। কারো কারো ধারণা সুলতান কুতবউদ্দিন এটা তৈরি আরম্ভ করেছিলেন। শেষ করেন ইলতুৎমিস। স্থানীয় লোকের ধারণা এটা আসলে পৃথ্বীস্তম্ভ। মহারাজ পৃথ্বীরাজ চৌহান এটা নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন। তিনি এটা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তাঁর পত্নী মহারাণী সংযুক্তার জন্য। মহারাণী যাতে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে এই মিনারে উঠে যমুনা দর্শন করতে পারেন। পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের পর সুলতান কুতবউদ্দিন এটা নতুনভাবে নির্মাণ আরম্ভ করেন। তবে নিম্নতল ছাড়া তিনি আর কিছুই নির্মাণ করতে পারেন নি। ইলতুৎমিস এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল নির্মাণ করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম তল এবং মাথার উপর গোলাকৃতি গম্বুজ তৈরি করেন সুলতান ফিরোজ তুঘলক। বর্তমানে এর উচ্চতা ২৩৮ ফুট। নিচের ব্যাস ৪৩ ফুট। চূড়ার কাছে ব্যাস ৯ ফুট। লোকের বিশ্বাস এতে সাতটি তল ছিল। উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট। গম্বুজের উপরে নাকি ছিল ষষ্ঠ তল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেটা ভেঙে পড়ে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে নতুন গম্বুজ বসানো হয়।

ইতিহাস যা-ই বলুক, ইতিহাসের উর্ধ্বেও একটা চিরন্তনী সত্য কাজ করে। সেটাই অধ্যাত্ম সত্য, চিরন্তনী সত্য। আমি যেন ইতিহাস ছাড়িয়ে কুতবমিনারের দেহে সেই চিরন্তনী সত্যের লেখা পড়তে পারলাম। মানুষের স্বপ্ন আকাশের দিকে উঠতে চায়। কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্থূল দেহ নিয়ে সে কিছুদূর উঠতে পারে তার বেশী নয়। এমন কি বর্তমান কালের রকেট নিয়ে পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু মহাবিশ্ব জগতের কেন্দ্রে যাবার তার

কোন ক্ষমতা নেই। সেই কেন্দ্রই হল সর্বোচ্য স্থান। বিজ্ঞানীদের রেডিও টেলিস্কোপ সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। হতাশ হয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, হবে না, বিশ্লেষণমূলক বিজ্ঞানে হবে না। সেই মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে যেতে পারে একমাত্র মানুষের অনুভূতি। সেজন্য অন্তরতম হয়ে অন্তরের মধ্যে বসতে হবে। এটাই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনা। ভারতবর্ষের যোগ সাধনা। সেই অধ্যাত্ম সাধনার পাশে স্থূল জগতের মানুষের শক্তি কত ক্ষুদ্র, কত অসহায়, সুউচ্চ কুতবমিনারের গাম্ভীর্য যেন সেই কথাই প্রমাণ করে। মানুষের ব্যর্থতা ইতিহাসের পাতায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে। মানুষের চোখ নেই, তাই সে দেখতে পায় না। ইতিহাসের অন্তরালের সেই ইতিহাসই পরম সত্য। কুতবমিনারের স্থাপত্য শিল্প থেকে আমি যেন সেই সত্যের স্পর্শ পেলাম।

কুতবমিনার কমবেশি আজো টিকে আছে। হয়তো একজন দরবেশের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল বলেই টিকে আছে। কিন্তু টিকে চিরকাল থাকবে না। স্থূল-জিনিষের যা পরিণতি হয় কুতব-মিনারকে সেই পরিণতির মুখোমুখি হতেই হবে। দর্শক এদৃশ্য থেকে কি নিয়ে যায় কে জানে! আমার মনটা ইতিহাসের এই অনিত্যতার কথা চিন্তা করে হাহাকার করতে লাগল।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে কুতবমিনারকে দেখলাম। তারপর কুতবের ছায়ার নিচে যেখানে প্রাচীন ইমারতগুলির ভগ্নাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে সেই দিকে এগিয়ে গেলাম। এই ইমারতগুলি মুসলমানদেরই স্থাপত্য কীর্তির কোন ধ্বংসাবশেষ বলে আমার মনে হল। কিন্তু কাছে গিয়ে পলেস্তারার ফাঁকে ফাঁকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম একজন গাইড দু'জন ইউরোপীয় পর্যটককে এই ইতিহাস-কাহিনী ব্যাখ্যা করে বোঝচ্ছেন। তাঁর ব্যাখ্যা থেকে যা বুঝলাম তার অর্থ এই: ঐতিহাসিক কানিংহামের মতে ১১৮০-৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথ্বীরাজ চৌহান এখানে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের জন্য সতেরটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এর পাঁচটি সারি এবং প্রত্যেক

সারিতে ৬৪টি করে স্তম্ভ ছিল। প্রত্যেক স্তম্ভে ছিল একটি করে দেব-মূর্তি ও শেকলে বাঁধা ঘণ্টা। মুসলমানেরা তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করে দিল্লী অধিকার করে এবং হিন্দু মন্দিরের উপর পলেস্তারা লাগিয়ে তাতে ফুল পাতা ও কোরাণের বাণী খোদাই করে দেয়। কিন্তু সত্যকে তো গোপন রাখা যায়না। সুতরাং সেই সত্য আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু আর একটি সত্য যা, তা কোন হিন্দু দর্শকের চোখে পড়ে কিনা, তাই ভাবি। সাধারণ হিন্দুরা দেবদেবী ও মূর্তির মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা চিন্তা করে আত্মসমর্পণ করে। তাদের এই সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে একদল প্রতারক যুগের পর যুগ তীর্থে তীর্থে অর্থ সংগ্রহ করে যাচ্ছে। কিন্তু এই মূর্তির মধ্যে সত্যিই ঐশ্বরিক কোন ক্ষমতা নেই। সত্য নিহিত আছে মূর্তির প্রতীকময়তার মধ্যে। সেই সত্যের সন্ধান কোন পূজারী ভক্তজনকে দেয়না। সে নিজেও এ সম্পর্কে কিছু জানেনা। মূর্তি সত্য নয়। মানুষের এই দেহেরই মত তা অসত্য ও অনিত্য। মানুষের দেহের বন্ধনের মধ্যে যেমন চিরসত্য রয়েছে, মূর্তির প্রতীকময়তার মধ্যেও তেমনই চির সত্যের অবস্থান। দেহকে শাশ্বত বলে ভাবলে আমরা যে ভুল করি, এই সব মূর্তিকেও নিত্য বলে ভাবলে আমাদের সেই ভুল হয়। মূর্তি যদি সত্য হত, তাহলে মুসলমান আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারত। সুলতান মামুদ সোমনাথের প্রবল প্রতাপান্বিত শিবলিঙ্গ ভেঙে দু' টুকরো করে দিয়েছিলেন। সেই ভগ্ন মূর্তি নিয়ে গজনীর মসজিদ সোপানে নামাজ প্রার্থীদের পাদস্খলনের ভিত্তি হিসেবে রেখেছিলেন। শিব বিন্দুমাত্র তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেননি। আসলে শিব লিঙ্গ তো একটা প্রতীক মাত্র। সেই প্রতীকার্থের মধ্যেই রয়েছেন শিব। সেই অর্থ বুঝলে শিবকে জানা হয়, বোঝা হয়। সেই অর্থকে কেউ ভাঙতে পারেনা, কলঙ্কিত করতে পারেনা। সেই অর্থ বুঝে কেউ যদি অর্থময় হন, তাঁকে কেউ কলঙ্কিত করতে পারেনা, ভাঙতে পারেনা।

বিশেষ একজন সাধক ব্যক্তির মুখে শিবের এই প্রতীকময়তার অর্থ

আমি জেনেছি। তাঁর মতে শিব আছেন তিন রকম। প্রথম হলেন কৃষ্ণশিব। সৃষ্টির আদি কারণ যখন তাঁর নিজের কাছেই অজ্ঞাত, তখন তিনি অন্ধকারে আচ্ছন্ন। উৎসের সেই অহংকারশূন্য অবস্থায়ই পুরুষের কৃষ্ণরূপ। শিব তখন কালো। যখন অব্যক্ত কারণে সেই কৃষ্ণ-পুরুষের মধ্যে আত্মজ্ঞান হয় তখন তিনি জ্ঞানের প্রতীক শ্বেতবর্ণ হন। তখন তিনি শ্বেতশিব। এই শ্বেতশিবের মধ্যে যখন ইচ্ছার তরঙ্গ জাগতে চায় তখন তিনি হন শিব লিঙ্গ অর্থাৎ সৃষ্টির সূক্ষ্মতম অবস্থা। লিঙ্গ অর্থ ই হল সূক্ষ্ম। শিব লিঙ্গে লিঙ্গ একা নয়, সঙ্গে আছে যোনি। যোনি আছে লিঙ্গকে ঘিরে। অর্থাৎ ইচ্ছা কেন্দ্রকে আবরিত করে আছে। কেন্দ্র থেকে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। লিঙ্গ পর্যায়ে এই ইচ্ছা এত সূক্ষ্ম .য পুরুষের সঙ্গে তা একাত্ম হয়ে আছে। সেই জন্য যোনিযুক্ত লিঙ্গ হয়েছে। এর পরই ইচ্ছার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে সৃষ্টির অপার লীলা। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব শুধু বইয়ে পড়ে জানা যায়না। অনুভব করতে হয়। অনুভব করতে হলে করতে হয় যোগসাধনা। যোগ সাধনায় কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠলে তবেই এই সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে বোধ জন্মে। সেই বোধ আমার হয়নি। কোন্ যোগসাধনা কিভাবে করলে সেই কুণ্ডলিনী শক্তি দেহের অভ্যন্তরে জেগে উঠে সেই যোগসাধনা আমি শিখিনি। সেই মহান সাধকের সাক্ষাৎ পাবার জন্যই আমি ঘর ছেড়ে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে বেরিয়েছি। কোথায় তাঁর সাক্ষাৎ পাব কে জানে! মানুষের স্থূল কীর্তির ক্ষেত্রে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবেনা ধরেই নিয়েছি। তবু যে এই স্থূল কীর্তিগুলি আমি দেখতে বেরিয়েছি, তার কারণ, স্থূল থেকেই সূক্ষ্মে উঠতে হয়। স্থূলের ত্রুটি বিচ্যুতিই সূক্ষ্ম সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে পারে।

কুতবের ছায়ায় ভাঙা ইমারত শ্রেণীর মধ্যে একটি লৌহ স্তম্ভ আছে। লৌহ স্তম্ভটি মুসলমান যুগের নয়। ইতিহাসে পড়েছি যে, এই লৌহস্তম্ভ গুপ্তযুগে তৈরি। স্থানীয় লোকের মধ্যে এই স্তম্ভ সম্পর্কে গল্প প্রচলিত আছে যে, মহারাজ থাবা নামে এক রাজা এটি তৈরি

করেছিলেন। কে থাবা জানিনা। গুপ্ত শাসকদের মধ্যে এমন নামে কোন রাজার নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই। যদি গুপ্তযুগের হয়, তাহলে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর তৈরি। যিনিই তৈরি করুন না এই স্তম্ভ, আশ্চর্য ধাতুতে তৈরি। কতকাল রোদ বৃষ্টি ঝড় এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে, স্তম্ভটিতে এতটুকু মরচে ধরেনি। অথচ আজকের উন্নত বিজ্ঞানের যুগে স্টেইনলেস ইস্পাতও এত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একদিন ভারতবর্ষ প্রাকৃত বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। শুধু ভারতবর্ষ নয়, প্রাচীন পৃথিবীর নানা দেশই একসময় প্রাকৃত বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত ছিল। মিশরের পিরামিড আজও বিস্ময়। 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ' গ্রন্থে দানিকেন প্রাচীন অনেক চমকপ্রদ বিজ্ঞানের অবদানের কথা বলেছেন। সেই প্রাচীন বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল মানুষ একদিন হারিয়ে ফেলেছে। ভারতবর্ষ হারায়নি, ভারতবর্ষ তাকে পরিত্যাগ করেছে। এই লৌহ-স্তম্ভের মত আরও অনেক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল ভারতবর্ষের মানুষের জানা ছিল। একদিন তারা পুষ্পক রথে আকাশে উড়তে পারত, পাশুপত অস্ত্রের মত ভয়ানক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রও তৈরি করেছিল যে অস্ত্র হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও শক্তিশালী। কিন্তু প্রাকৃত বিজ্ঞানে এতদূর এগিয়েও ভারতবর্ষ আবার ফিরে এসেছে। বুঝতে পেরেছে, বিশ্লেষণী বিজ্ঞানে সত্যের কাছে যাওয়া যাবে না। সত্যকে জানতে হলে বহির্বিশ্বে নয় অন্তর-বিশ্বে ডুব দিতে হবে। উপনিষৎ এই জন্যই বলেছিল, আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান, Know thyself. আজ মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা সেই জন্যই মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থল জানতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে বলছেন, বিশ্লেষণী বিজ্ঞানের সাহায্যে তাকে জানা যাবে না। তাকে জানতে হলে, অন্তরের মধ্যে ডুব দিতে হবে। ভারতীয় বিজ্ঞানের অবদানে এই অপূর্ব লৌহস্তম্ভটি যুগজয়ী বটে কিন্তু কালজয়ী নয়। কালজয়ী একমাত্র মানুষের অন্তরতম অন্তরাত্মা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলাম লৌহ স্তম্ভটিকে, মাটি থেকে ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু। ব্যাস মাটির কাছে ১৬ ফুট ৪ ইঞ্চি, মাথার দিকে ১২ ফুট ৫ ইঞ্চি। হাত দিয়ে বেড় পাওয়া যায় না।

কাউকে কাউকে বলতে শুনলাম, এর ভিত্ নাকি মাটির এত নিচে যে, তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এ-সবই লোকের বানানো কথা। অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, এর ভিত মাটির নিচে তিন ফুট পর্যন্ত। পাথরের উপর আটটি দণ্ডের উপর দৃঢ় করে আটকানো। দিল্লীর লোকের বিশ্বাস ছিল—যতদিন থাবার এই স্তম্ভটি থাকবে ততদিন দিল্লীর হিন্দু রাজত্বও টিকে থাকবে। কিন্তু সেটি যে থাকেনি, তা জানার জন্য কোন বড় ইতিহাস বইয়ের পাতা খুলতে হয় না। দিল্লীর এই লৌহস্তম্ভকে কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তী তা যেমন মিথ্যা, এই লৌহস্তম্ভটিও তেমনই মিথ্যা। যুগজয়ী হলেও কালজয়ী সে হতে পারবে না। এই যে সৃষ্ট বিশ্ব, এর কোনটাই কালজয়ী হবে না। সময়ের আপেক্ষিক বিচারে কারো আয়ু বেশী, কারো কম। যা থেকে সময়ের সৃষ্টি সেই উৎসের বিচারে কোটি কোটি বছরও যথার্থই চোখের পলক মাত্র, কিংবা তাও নয়। কে চিন্তা করে সে কথা ! কে চিন্তা করে প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তিগুলি দেখে যে, একদিন এর সৃষ্টি নিয়ে যে স্রষ্টারা গৌরব করতেন, তাঁরা আর নেই ! যাঁরা একে ধ্বংস করেছেন তাঁরাও নেই। যাঁরা আজ এইসব প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কীর্তিগুলি দেখে ইতিহাসের গন্ধ পাবার চেষ্টা করছেন তাঁরাও একদিন থাকবেন না। অসত্য থেকে নিত্যের প্রতি এই যে ইঙ্গিত, স্থূল থেকে সূক্ষ্মের প্রতি এই যে ইঙ্গিত, আমরা মানুষ হয়ে সেটাই ধরতে পারি না, এই আমাদের ট্র্যাজেডি।

লৌহস্তম্ভ ছেড়ে ঘুরে ঘুরে আশে-পাশের অন্যান্য ভগ্ন ইমারতগুলি দেখতে লাগলাম। দেখলাম কুয়াতুল মসজিদ। তারই আশেপাশে সুলতান ইলতুৎমিসের সমাধি। কুয়াতুল মসজিদ, সুলতানের সমাধি সবই জরাজীর্ণ। মৃত্যুকে আবরিত করে রাখার জন্য মানুষের বিজ্ঞানে কোন কিছুই আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। মিশরের মমিও চিরকাল বাঁচবে না। কে বোঝে, ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য দেখে সে কথা কে বোঝে !

ঘুরে ঘুরে অন্য ইমারতগুলি দেখলাম। সব ইমারতের ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করা কঠিন : তাদের পরিচয় জানার জন্য আধুনিক ভারত

সরকার তেমন কিছু করেননি। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য একজন বিদেশী শাসকই চেষ্টা করেছিলেন, তার নাম লর্ড কার্জন। এতে দু'দেশের মানুষের দুটি মানসিকতাই প্রকাশ পায়। ইউরোপ বস্তুবাদী, বস্তুর প্রতি তার দরদ। ভারত অধ্যাত্মবাদী—বস্তুর অনিত্যতা সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল। সেইজন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যখন প্রাচীনকালে ইতিহাস লেখা হয়েছে ভারতবর্ষে লেখা হয়েছে বেদ-বেদান্ত। ভারতের এই মানসিকতা সচেতন ভাবে না হোক অচেতন ভাবে এদেশের মানুষের মধ্যে কাজ করে চলেছে।

কুতবের ছায়া থেকে কিছুদূরে দক্ষিণ পশ্চিমে আলাউদ্দীনের কলেজ ও সমাধি। এখন ধ্বংসপ্রায়। আপন শক্তির অহংকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি বিরাট কলেজ তৈরি করেছিলেন। চতুষ্কোণ সৌধটি সম্ভবতঃ আলাউদ্দীনের সমাধি। নিশ্চিন্ত করে ঐতিহাসিকেরা এখনও সে কথা বলতে পারছেন না। হায়রে মানুষ আর তার অহংকার! যে আলাউদ্দীনের অহংকৃত পদভারে ভারতবর্ষ একদিন টলমল করত, আজ তাঁর গোরস্থানও সঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি এই চতুষ্কোণ সমাধিটি তাঁরই সমাধি হয় তাহলেও মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি এ এক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। মাটির নিচে ঘুমাবার জন্য একটি মানুষের দরকার তার দেহের পরিমাপে সামান্য একটু ভূমি মাত্র। কিন্তু সে ভূমিও নির্মম। চিরকাল কাউকে বিশেষত্ব দিয়ে স্বতন্ত্র করে ধরে রাখেনা। মাটির নিচে একদিন মানুষের দেহমজ্জা সব মুছে যায়। যে সমাধির আবরণে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা চলে, কালের আক্রমণে তাও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবু এই সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হবার জন্য মানুষের কি প্রাণান্তকর চেষ্টা! মানুষের আপন শক্তির বিরুদ্ধে ইতিহাস প্রচণ্ড বিদ্রূপ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু দর্শকের দুর্ভাগ্য এই যে, সেইসব পুরাকীর্তি দেখে মানুষের achievement সম্পর্কে সে গর্ববোধ করে, তার তুচ্ছতা ও অনিত্যতার কোন হদিশই পায় না।

আলাউদ্দীনের কলেজের কাছেই আছে বিখ্যাত আলাই দরজা। আলাই দরজার কাছে রয়েছে একটি চতুষ্কোণ হল ঘর। একটি মাত্র গম্বুজ দিয়ে ছাদ তৈরি। লাল রংয়ের বেলে পাথরে নির্মিত আলাই দরজা। মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের এই আশ্চর্য কীর্তি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার দীর্ঘশ্বাস যেন বহন করে চলেছে: স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি ভারমুক্ত সে এখানে নেই।

কাছাকাছিই একটি অসমাপ্ত মিনার। একটি বিরাট পরিকল্পনায যে মিনারটি আরম্ভ করা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ হয়নি। মিনারের গেটে একটি প্লেটে পবিচয় পত্র লেখা। মিনারটি তৈবি আরম্ভ করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী। কুতব মিনারের দ্বিগুণ আকারে এই মিনার তৈরি করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু কাজ শেষ করতে পারেননি। ৮৭ ফুট পর্যন্ত উঠেই মিনারের কাজ আর শেষ হয়নি। মানুষ ইচ্ছা করতে পারে, কিন্তু তার 'ইচ্ছা' তার নিজেব বলেই পূর্ণতা লাভ করবে, এমন কোন কথা নেই। ইউরোপীয়রা এই সত্যটি আবিষ্কার করতে পেরেছিল বলেই প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি করেছে: Man proposes God disposes. আপাতদৃষ্টিতে কথাটা অত্যন্ত সত্য হলেও ভারতবর্ষ এই আপাতঃ সত্যকে স্বীকার করে না। Man-এর proposal Man-ই সফল করতে পারে, God নয়। Man ও God-এ ভারতবর্ষ কোন তফাৎ দেখেনি। মানুষ যদি ভেতরকার মানুষের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে তবে সে নিজেই দেবতা হয়। ভারতবর্ষ ভেতরকার এই মানুষকেই বলেছে 'মানুষ-রতন'। যে মানুষ নিজের ভিতরের এই মানুষ-রতনের সন্ধান পায় সে-ই খাঁটি মানুষ। সে-ই God. যে মানুষ তা পারেনা সে সীমিত মানুষ। সুতরাং বিদেশী প্রবাদ বাক্যকে এইভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে: limited man proposes God disposes. Europe-এর মানুষও যে, মানুষের মধ্যে মানুষ-রতনের খোঁজ পায়নি তা নয়। ডঃ গ্রোডেক, মানুষের অন্তরতম একটি ব্যাখ্যাতীত ইচ্ছার নাম দিয়েছিলেন 'The It'. তাঁর

মতে এই 'The It' যদি ইচ্ছা করে তবেই মানুষের রোগ হয়, সে যদি ইচ্ছা করে তবেই নিরাময় হয়। সে ইচ্ছা করলে তবেই মৃত্যু হয়। মানুষের ভালমন্দ সুখ-দুঃখ সবই তাঁর নিজের ইচ্ছায়। নিজের ইচ্ছায়ই মানুষের সুখ, নিজের ইচ্ছাতেই মানুষের দুঃখ। মানুষ সেটা বুঝতে পারে না এই যা। মানুষের সেই অন্তরতরের কিছুটা হদিশ ফ্রয়েডও পেরেছিলেন। তার 'unconscious mind' কিছুটা সেই পর্যায়ের। 'unconscious mind'-এর হদিশ মানুষের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। 'Subconscious mind' এর যতটুকু ধরা পড়েছে, তাতেই বিচিত্র রহস্যের দুয়ার মানুষের কাছে খুলে গেছে। সেই 'Subconscious mind' আজ ইউরোপের শিল্প সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেই থেকেই আজ অধিবস্তুবাদী বা সুররিয়ালিস্ট শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি। এই গভীরতর মনের খবর পেয়েই অভিভূত হয়ে বৈজ্ঞানিক Pascal বলে উঠেছিলেন "The heart has its reason of which reason knows nothing." ইউরোপ এত কিছু জেনেও Man ও Godকে পৃথক করে রেখেছে। ভারতবর্ষ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছে। ভারতবর্ষ জীবের মধ্যেই শিবকে দেখত। আলাউদ্দীনের অসমাপ্ত মিনার প্রমাণ করে যে, পরিপূর্ণ মানুষ সে হতে পারেনি। মনুষ্যত্বের সাধনা না করে সে অ-মনুষ্যত্বের সাধনা করেছে। মানুষ যদি পরিপূর্ণ মানুষ না হতে পারে, তবে তার যে ট্র্যাজেডি, তা তাকে ভোগ করতে হয়। আলাউদ্দীন, এবং জগতের রাজা বাদশা সকলেই সেই অপরিপূর্ণতা থেকে ভুগেছিলেন। এর মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিলেন ভারতসম্রাট অশোক। ইউরোপীয় মনীষী H. G. Wells তাই অশোক সম্পর্কে বলেছেন—'Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majesties and graciousness and serenities and royal highnesses and the like, the name of Asoka shines and shines almost alone, a star,' অর্থাৎ

যে লক্ষ লক্ষ নরপতি ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলংকৃত করে আছেন, সম্রাট অশোক তাঁদের মধ্যে একাকী একটি নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করছেন।' এই সম্রাট অশোকও মানুষের মধ্যে 'মানুষ-রতন', গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ করতে পেরেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। তবে তিনি যে স্থাপত্যকীর্তি রেখে গেছেন তার বাস্তব অংশ স্থায়ী না হলেও, ইঙ্গিতার্থ চিরন্তন হয়ে থাকবে হয়তো। তাঁর ধর্মচক্র চিরকাল মানুষ-রতনের দিকে ইঙ্গিত জানাবে।

কুতবের ছায়া থেকে ইতিহাসের অনিত্য সাক্ষ্য দেখে বেরিয়ে এসে আবার আমার অটোরিক্সায় চাপলাম। এইবার অটোরিক্সা আমাকে নিয়ে গেল মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির অরণ্যের মধ্যে একটি মরুদ্যান সদৃশ্য হিন্দুতীর্থে। কুতবের কাছাকাছিই ভারতবর্ষের একটি দুর্লভ মন্দির আছে। সে মন্দিরের নাম যোগমায়া মন্দির। কুতবমিনার থেকে এক ফার্লং দূরেই এই মন্দির অবস্থিত। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের বোন। দেবকীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল। কংস তাঁকে হত্যা করতে গেলে তিনি আকাশে উড়ে যান। যোগমায়া আর কেউ নন, স্বয়ং মহামায়া। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহোদরা বলা হয়েছে তাঁকে এই কারণে যে, পুরুষের মধ্যে যে অব্যক্ত, অজ্ঞাত ইচ্ছার জন্ম, তার সঙ্গে পুরুষের ফারাক এতই কম যে, মনে হয় দুয়ের জন্ম একই সঙ্গে একাত্মভাবে। এই যে অস্ফুট, অব্যক্ত পরমাশক্তি, যিনি পুরুষকেও আচ্ছন্ন করে থাকেন, তিনিই মায়া। পুরুষের নিদ্রা হল তাঁর যোগনিদ্রা। এই নিদ্রাই মায়া। এইজন্য এই মায়া যোগমায়া নামে পরিচিত। এই যোগমায়ার স্বরূপ একমাত্র যোগের মাধ্যমেই জানা যায়। ভারতবর্ষে অন্যত্র কোথাও যোগমায়ার মন্দির নেই। এই আশ্চর্য মহাশক্তির অস্তিত্ব যাবনিক শক্তির আড়ালে কি করে বেঁচে আছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। লোকের বিশ্বাস এই যোগমায়া মন্দির এখানে ছিল খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে আর্য সভ্যতা ভারতবর্ষে নিজেকে বিস্তার করতে পেরেছিল বলে

ইতিহাসে কোন সাক্ষ্য নেই। সে সময় ভারতবর্ষের মাটিতে সিন্ধু-সভ্যতা জাতীয় সভ্যতার প্রভাব ছিল। যোগব্যবস্থা সিন্ধুসভ্যতারই ব্যবস্থা। সিন্ধু অঞ্চলের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে যোগাসনে বসা মূর্তি পাওয়া গেছে। সিন্ধু অঞ্চলের পশুপতি মূর্তিও যোগাসনে আসীন। পশু দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত, অর্থাৎ মায়া দ্বারা। মায়া মানেই পাশ যা পুরুষের যথার্থ তত্ত্ববোধকে আচ্ছন্ন করে রাখে। পাশ থেকেই পশু। সিন্ধু-সীলমোহরে যে পশুপতির মূর্তি পাওয়া গেছে তা পশুদ্বারা অর্থাৎ মায়া দ্বারাই পরিবেষ্টিত। এই যোগমায়ার চিন্তা প্রাগার্যযুগেই ভারতে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ অনার্য দেবতা। যোগমায়া অনার্য দেবী। ভারতমৃত্তিকায় সনাতন ধর্মের মূলে রয়েছেন এঁরা। সেই অর্থে খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে দিল্লীতে যোগমায়া দেবীর মন্দির সম্ভব। তবে সে মন্দিরের অস্তিত্ব আজ আর নেই। বর্তমান মন্দির নির্মিত হয় ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে। সেই মহাশক্তি মহামায়া যোগমায়ার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। তিনি যদি করুণা করেন, তবেই সত্য সন্ধানীর সন্ধান সার্থক হয়, নইলে নয়।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। এক শ্মশানকালীর মন্দিরে গিয়েছি ৺মাকে প্রণাম করতে। দেখি এক পিশাচসিদ্ধ ভয়াবহ সাধু বসে আছেন মন্দিরের সামনে। ৺মাকে প্রণাম করতে দেখে আমায় বললেন, ৺মাকে প্রণাম করছ কেন ?

তখন মূর্তি সম্পর্কে অগাধ বিশ্বাস। তখন কবীরের দোঁহা পড়িনি যে, বলব, রাম যদি মূর্তির মধ্যে থাকেন, তাহলে বাইরে থাকেন কে ? তখন মূর্তি মানেই দেবতা। তিনি মিথ্যা নন, তিনি তখন সত্য। সুতরাং এহেন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলাম। জবাব দিতে পারলাম না।

পিশাচসিদ্ধটি নিজেই বলল, মা হলেন মায়া। পরম সত্যকে আচ্ছন্ন করে আছেন। মায়াকে প্রণাম করে কি লাভ ? সত্যকে কি দূরে রাখতে চাও ?

নিজেকে বিভ্রান্ত বোধ করেছিলাম। আজ যদি হত, বলতাম, সত্যকে জানতে হলে, যিনি সত্যকে আচ্ছন্ন করে আছেন, তাঁকেই আগে পূজা করা দরকার। রাজদর্শন পেতে হলে দারোয়ানকে ঘুষ দিতে হয়। বাড়ির কর্তাকে খুশি করতে হলে গিন্নীর তোয়াজ করতে হয় প্রথম। সুতরাং সত্যের কাছে যেতে হলে সত্যের শক্তিকে আগে আয়ত্ত করতে হয়। সত্যসন্ধানী যাঁরা তাঁরা ৺মাকেই আগে পূজা করেন, ৺মাকেই আগে খুশি করেন।

যোগমায়া মন্দিরের কাছাকাছিই আরো অনেক মধ্যযুগীয় ইতিহাসের নিদর্শন আছে। যোগমায়া মন্দির থেকে বেরিয়ে সেই সব দেখলাম। দেখলাম আধম খাঁর সমাধি, বাওলি, সুলতান ঘোরীর সমাধি, কুতবদরগা, সিকন্দর লোদীর সমাধি, হাউস খাস, শিরি, জাহাঁপনা, লালকোট, এইসব। শিরি তৈরি করেছিলেন, সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী। জাহাঁপনা তৈরি করেছিলেন মহম্মদ তুঘলক। তৈরি করেছিলেন শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। কিন্তু তা সত্বেও জাহাঁপনা অর্থাৎ 'দুনিয়ার আশ্রয়' নিজেকেই রক্ষা করতে পারেনি বিদেশী অক্রমণের হাত থেকে। তৈমুরলঙ জাহাঁপনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিয়েছিলেন। লালকোট তৈরি করেছিলেন রাজপুত রাজা অনঙ্গপাল। সব কিছুই আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত, শুধু পশ্চিমদিকের প্রাচীরগুলি আজও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। ঐ প্রাচীরগুলি আর লৌহস্তম্ভই হল লালকোটের স্মারক চিহ্ন। মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই রায় পিথোরা অর্থাৎ পৃথ্বীরাজ চৌহান এই দুর্গ তৈরি করেছিলেন।

কুতবের কাছাকাছি প্রাচীন দিল্লী থেকে তোগলকাবাদ বেশ কিছু দূরে। এ-সব দেখা হলে অটোরিক্সা আমাকে তোগলকাবাদের দিকে নিয়ে গেল। তোগলকাবাদের দূরত্ব কুতব থেকে মাইল চারেক। দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক। সেকালে এত দুর্ভেদ্য দুর্গ ভারতবর্ষে আর কোথাও ছিল না। সমকালীন সমরনীতি

প্রয়োগ করে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব ছিলনা। দুর্গের পনেরটি প্রবেশদ্বার ছিল। ছিল সাতটি জলাশয়। কঠিন নিরেট পাহাড় ভেদ করে খনন করা হয়েছিল ৮০ ফুট গভীর নলকূপ। ব্যাপক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আজও দুটো সৌধের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়— জুমা মসজিদ ও বুরুজ মিনার। কিছুটা অনুমান করা যায় সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সমাধি। মানুষের চেষ্টা অদৃশ্য শক্তির কাছে কত অসহায়, এই দুর্গের পরিণাম দেখলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তোগলকাবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে ইতিহাসে যে গল্প প্রচলিত আছে তা থেকে জানা যায় যে, যে মানুষের মধ্যে মানুষ-রতন জেগেছে সেই মানুষে আর সাধারণ মানুষে তফাৎ কোথায়। বাংলাদেশ জয় করে তোগলকাবাদে ফিরছেন গিয়াসুদ্দীন তুঘলক। ত্রিহুত এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমন সময় দিল্লী থেকে বড় চিন্তার খবর এল, কয়েক হাজার বান্দা কিনেছেন তাঁর পুত্র জুনা খাঁ অর্থাৎ পরবর্তী কালের মহম্মদ বিন তুঘলক। সোনা দানা ছড়িয়ে অনেক আমীরকেও হাত করেছেন। তাঁর সঙ্গে জুটেছেন একজন দরবেশ, নিজামউদ্দীন আউলিয়া। তিনিই বিদ্রোহে প্ররোচনা দিচ্ছেন জুনা খাঁকে। আউলিয়া নাকি বলেছেন, অচিরেই জুনা খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন। শিবির গুটিয়ে গিয়াসুদ্দীন দ্রুত ছুটলেন দিল্লীর দিকে। হুঁশিয়ারী পাঠালেন দিল্লীতে বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দেবেন বলে। জুনা ভয় পেয়ে ছুটে গেল নিজামউদ্দীন আউলিয়ার কাছে। দরবেশ বললেন, কোন ভয় নেই। গিয়াসুদ্দীন দিল্লীতে ফিরতে পারবে না— 'দিল্লী দূর অস্ত্।' দিল্লী তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে।

হলও তাই। জুনা খাঁ দিল্লীর কাছে আফগানপুর গিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলককে। অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হল বিরাট কাঠের মণ্ডপ। আফগানপুরের সবুজ ময়দানে সুলতানকে প্রথম অভ্যর্থনা জানানো হল। তারপর কাঠের মণ্ডপে করা হল খেলাধুলার আয়োজন। সুলতানের অনুমতি নিয়ে হাতীর খেলা শুরু

হল। কয়েকটা হাতীর গায়ের ধাক্কা লেগে এক সময় সমগ্র মণ্ডপটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের উপর। বহু লোক মারা গেল। সুলতানও রেহাই পেলেন না। দিল্লী আর তাঁর ফেরা হলনা। 'মানুষ রতন' যাঁর মধ্যে জেগেছে, সেই মানুষ আর সাধারণ মানুষের মধ্যে তফাৎ এই যে, মানুষ-রতনের অধিকারী নিজের ইচ্ছা-শক্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সব। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয় আত্মবলে। সাধারণ মানুষ স্থূলদেহে স্থূলশক্তিতে ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করে। সে ইচ্ছা সফল হলেও ব্যর্থতার আবরণ গায় লেগে থাকে। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ইতিহাসের পাতায় ছাত্রদের কাছে আছেন। আপামর ভক্তজনের কাছে আজো নিজামউদ্দীন আউলিয়া বেঁচে আছেন। নিজামউদ্দীনের সমাধিও ধ্বংস প্রায়। কিন্তু নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধি ধ্বংস হয়ে গেলেও যে সত্যের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়েছিলেন তাঁর শেষ নেই।

তোগলকাবাদ দেখা শেষ হতেই অটোরিক্সা আবার চলল। দেখলাম অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়ানো ওখ্‌লা। পথ থেকেই দেখলাম কলকাজী। শেষে এলাম মানুষ-রতন যাঁর মধ্যে জেগেছেন সেই নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগাতে। পথে আসতে দেখে এলাম মহাত্মাজীর স্মৃতি-উদ্যান রাজঘাট। নেহেরুর শান্তিবন। রাজনৈতিক নেতা গান্ধীজীর আন্দোলনের কলাকৌশল নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি প্রশ্নের অতীত। তাঁর সর্বোদয়তত্ত্বও প্রশ্নের অতীত। মনুষ্য-সমাজের মূল লক্ষ্য যদি তার পার্থিব উন্নতি হয়, তাহলে সে তত্ত্ব আর যাই হোক, পৃথিবীতে কোনদিন শান্তি আনতে পারবে না। পার্থিব সত্তাটাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আত্মিক উন্নতি ছাড়া সেই সত্তার যথার্থ শান্তি কোথায়? যদি সম্পদ এবং বৈভব মানুষকে তার চরম শান্তি দিতে পারত, তাহলে আমেরিকা ইউরোপের ধনীর দুলালদের আত্মিক কোন সংঘাতই থাকত না। এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা ইউরোপের বহু ধনী ব্যক্তি আত্মহত্যা

করতেন না! আমাদের কবির সেই অনুভব একটি বিভ্রান্তিকর সত্য অনুভব। (কবি জীবনানন্দ যথার্থই বলেছেন—

'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়,
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়,
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে,
আমাদের ক্লান্ত, ক্লান্ত করে……'

এই ক্লান্তি আত্মস্বরূপ না জানার ভ্রান্তি থেকে। বাঁচতে হলে যেমন আহার্য চাই, গৃহ চাই, বসন চাই, তেমনি চাই মনের প্রশান্তি। সম্পদের জন্য যেমন সম্পদের চর্চা করতে হয়, মনের প্রশান্তির জন্যও তেমনি আত্মচর্চা করতে হয়। বর্তমান পৃথিবীতে এই উভয় বিধের সম্মিলিত প্রগতিতেই মানব জাতির যথার্থ প্রগতি। মানুষ যদি আইন মেনে চলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকবে। কিন্তু সম্প্রীতি থকেবে কি? আইন দিয়ে, নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে কারো ভাল করা যায় না, যদি না ভালবাসার তাগিদে মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এই জন্য অন্তরকে সেই স্তরে উন্নীত করতে হবে, যেখান থেকে সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিটি প্রাণীকেই আত্মবৎ মনে হবে। মানুষে মানুষে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন হলে তবেই এক মানুষ আর এক মানুষের যথার্থ মঙ্গল করতে পারে। এই আত্মপ্রসারতার জন্যই সম্রাট অশোক জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট বলেছিলেন —'আমি শুধু জনগণের নিরঙ্কুশ প্রভু নই, তাদের প্রথম ভৃত্যও।' এই ভৃত্য হয়ে তিনি জনগণের সেবা করতে চেয়েছিলেন। ভৃত্যের সেবায় কিছুটা যান্ত্রিকতা আছে। অফিসের কেরানীর মত কাজ আছে। কিন্তু মা বা বাবা যখন সন্তানের জন্য কাজ করেন তখন সেবার ঊর্ধ্বে তাঁরা অন্তরের যে স্নেহ ঢেলে দেন তাতে সেবা কল্যাণময় ও মধুর হয়ে ওঠে। অশোক সেই পিতামাতার ভূমিকায় রাজার আসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সমস্ত প্রজা তাঁর সন্তানবৎ। মানবতার সার্বিক উন্নতি তখনই, যখন তার পার্থিব ও আত্মিক উভয়বিধ উন্নতি

একই সময় হয়।) আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী সোয়াইৎসার তাই তার 'The Civilisation and Ethics' গ্রন্থে বলেছেন যে, বৈভব চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম চর্চাও করতে হবে। মহাত্মাজীর সর্বোদয়ের নীতি হল সেই সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিকল্পনা। ভারতীয় রাজনীতির জটিল আবর্তে মহাত্মাজী ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর মধ্যে মানুষ-রতন জেগেছিল। কিন্তু তাঁর চারদিকে ছিল অমানুষ। তাই তাঁকে কেউ বোঝেনি। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। নেহেরুর শান্তিবন আলংকারিক অর্থে তৈরী। মহাত্মাজীর রাজঘাট যথার্থই রাজঘাট। শ্রেষ্ঠ ঘাট সেই ঘাট যে ঘাটে মানুষ এপার ওপার করতে পারে। যেখানে মানুষ ইহলোকের সঙ্গে আত্মলোকের যোগাযোগ করতে পারে। মানুষের মধ্যে যে মানুষ-রতন জাগলে মানুষ অবহেলায় মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে, জীবন ও মৃত্যু মানুষের কাছে সমান হয়—মহাত্মাজী ছিলেন যথার্থ সেই শ্রেণীর মানুষ।

নিজামউদ্দীন আউলিয়া ও মহাত্মাজী একই শ্রেণীর মানুষ, সুতরাং রাজঘাটের পর যখন নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগায় এলাম তখন ধূপের পবিত্র গন্ধে আমোদিত এই তীর্থক্ষেত্রটিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে হল। হিন্দু তীর্থক্ষেত্রের মত এখানেও পাণ্ডা। পাণ্ডা এখানে রয়েছে গাইডের ছদ্মবেশে।

লোকে ফুল কিনে ফুল দেয়, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। আমি কখনও তা করিনা। 'ফুল নিজের জন্য ফোটে না' সেন্টিমেণ্টাল কবির এই ধরনের কাব্যিক উচ্ছ্বাসে আমার বিশ্বাস নেই। আমি মনে করি, ফুল গাছের বিশেষ প্রয়োজনে, সৃষ্টির প্রয়োজনে ফোটে। যে ফুল ঝরে পড়ে সে ফুল অপ্রয়োজনীয় ফুল, তা দিয়ে পূজো করা যেতে পারে। কিন্তু ফুলের বোঁটা ছিঁড়ে সেই ফুল এনে শ্রদ্ধা ভক্তি জাগানোর কোন সার্থকতা নেই। বলি দিয়ে পূজো করার মতই এটা একটা অপরাধ। অপরকে ব্যথা দিয়ে ভক্তি জানানো বা সৌন্দর্য উপভোগ করার কোন যুক্তি নেই। এক গুচ্ছ ফুল গাছের ডগা থেকে ছিঁড়ে এনে ফুলদানীতে

রেখে সৌন্দর্যপিপাসা তৃপ্ত করা অপরের সুন্দরী স্ত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে উপভোগ করার মতই অপরাধের বিষয়। সেইজন্য ফুল না কিনেই আমি দরগাতে এলাম। বেশ দামী ধূপ কিনে ধূপ জ্বালিয়ে দিলাম। তারপর গাইডের কাছে নিজামউদ্দীনের কাহিনী শুনতে লাগলাম। দেখলাম এই মরমীয়া সাধকের মূল সত্যের সঙ্গে গাইডটির পরিচয় নেই। যেমন কালীঘাটের পাণ্ডার সঙ্গে নেই মাতৃ-মহিমার যথার্থ পরিচয়।

কথায় কথায় গাইডটি বলল যে, নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগা ও সমাধি তৈরী করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী। কথাটা অবিশ্বাস্য। নিজামউদ্দীন আউলিয়া গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের আমলের লোক। মারা যান মহম্মদ তুঘলকের আমলে। আলাউদ্দীন কি করে তাঁর সমাধিসৌধ তুলতে পারেন? কিন্তু পাণ্ডার গল্পের সত্যতা ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করতে নেই। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ'-এর তত্ত্বই কার্যকর:

'যা রচিবে তাই সত্য তুমি—
কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেন।'

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধির পাশেই কবি আমীর খসরুর সমাধি। বিদেশীরা যাঁরা ভারতে এসে ভারতীয় হয়েছিলেন কবি আমীর খসরু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মধ্যে মধ্যভারতীয় সাধক কবিদের মরমীয়া সুর আছে। সেইজন্যই মৃত্যুর পর তাঁর স্থান হয়েছে —একজন দরবেশের পাশে। ইনিই ভারতের প্রথম উর্দু কবি। হিন্দীতেও তিনি কবিতা রচনা করেছেন। ভারতে ফার্সী ভাষাতে যাঁরা কাব্য রচনা করে গেছেন এককথায় তিনি তাঁদের সবার চাইতে বড়। আসল নাম ইয়ামিন উদ্দীন মহম্মদ হাসান। আমীর খসরু বা খুসরভ নামে বেশি পরিচিত। জাতিগতভাবে তুরস্কের লোক। এঁর বাবা তুর্কিস্তানের কাশ নামক নগরীর অধিবাসী। চিঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে

মোঙ্গলরা মধ্য এশিয়া উৎখাত করে দিলে ভারতে এসে আশ্রয় নেন। আমীর খসরুর জন্ম পাতিয়ালাতে ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারে সভাকবির চাকুরী নেন। কিন্তু শেষ জীবনে দরবারের চাকুরী ছেড়ে দেন। পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষাও ত্যাগ করেন এবং নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য হন। চল্লিশ হাজারেরও বেশি কবিতা লিখে গেছেন তিনি। মৃত্যুর পর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল বাহাত্তর। ভারতেব সাধারণ মানুষেব প্রতি তাঁর দরদের শেষ ছিলনা। তাই তিনি বলেছিলেন, 'Every pearl in the royal crown is but the crystalised drop of blood fallen from the tearful eyes of the poor peasants.

পাশেই আর একটি কবর রয়েছে, মোগল শাহজাদী জাহান আরার কবর। সেখানেও ধূপ জ্বেলে দিলাম। এই এক ভাগ্যহীনা রমণী। সব কিছু থেকেও তাঁর কিছুই ছিলনা। কামনা বাসনাক্রান্ত মোগল হারেমে তিনিই একাকী সন্ধ্যাতারার মত স্নিগ্ধ আলোতে নিজেকে দহন করেছেন। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিঃসঙ্গিনী অবস্থাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ধূপ দিতে দিতে মনে মনে বললাম, তোমার আত্মার শান্তি হোক। কোন মানুষের যোগ সাধনায় অন্তরতম মানুষ-রতন জাগে। কারও জাগে ভক্তি যোগে। কারো জাগে বেদনাতে। আঘাতেবিঘাতে ক্ষত বিক্ষত এই শাহজাদীর অন্তরে বোধহয় মানুষ রতন জেগে উঠেছিল। তাই তিনি সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে শায়ের রচনা করে গিয়েছিলেন ঃ

'সৌধ তুলে দিয়ো নাক, আমার কবর ঢাকবে ঘাসে
ভাগ্যহীনার যোগ্য কবর এই ছাড়া আর কীইবা আছে !'

তাঁর অন্তরের 'বেদনা নীল আকাশে আজও ছড়িয়ে আছে। তাঁর শায়ের সেই বেদনাকে প্রকাশ করছে ঃ

'মেদি পাতা যে স্নিগ্ধ কোমল ওযে শুধু ওর বাহিরে,
ভেতরে অবাক শুধু রক্তরাগ দেখিনা আমরা চাহিরে।'

পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষার এই পরিণতি। সেই বেদনার্ত পরিণতির কথা কান্নার আকুল আবেগে নিজের শায়েরের মধ্যে রেখে গেছেন কবি শাহজাদী জাহান আরা।

জাহান আরার কবরের পর গাইড বাদশা মহম্মদ শার কবর দেখালো। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই আর একটি বাদশা। কিন্তু জাহান আরা বেগম যেমন অন্তরের কান্নার স্নিগ্ধতার মধ্যে মানুষ-রতনকে জাগাতে পেরেছিলেন, মহম্মদ শা তা পারেননি। তাঁর স্থূল বাসনা কামনা অন্তরের মধ্যে চিতাগ্নি জ্বালিয়েছে শুধু। কোন শান্তির প্রলেপ সৃষ্টি করতে পারেনি। এঁরই আমলে নাদিরশা ভারত আক্রমণ করে দিল্লী-সাম্রাজ্যের শেষ সম্মানটুকু ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। বাজারের একজন বাঈজীকে প্রধানা বেগম করেছিলেন তিনি—উধমবাঈ। তাতে সাম্রাজ্যের মর্যাদা আরো নেমে গিয়েছিল। তাঁরই পুত্র আহম্মদ শা, তিনিই বাদশা হয়েছিলেন। এইসব হতভাগ্য বাদশার জীবনে যে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয়েছিল শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির চাইতেও তা করুণ। মোগল ইতিহাস আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তার বীর্যে নয়, কর্মে নয়, বিলাসেও নয়, তার অশ্রুতে। অথচ সে অশ্রু মানুষের মধ্যে মানুষ-রতনকে জাগাতে পারেনি। এটাই হল দুঃখের। দর্শকেরা এ থেকে অনিত্য সংসারের যে বিচিত্র ইতিহাস পেতে পারেন তা তাদের মধ্যে মানুষ-রতনকে জাগাতে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু কয়জনেই বা আমরা সে দৃষ্টিতে তাকাতে পারি। শেলীর 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought' এর যথার্থ মূল্যায়ন কজন অধ্যাপকই বা করতে পারেন?

একটা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগা দেখা শেষ করে বেরিয়ে আসতেই গাইডটি একটি খাতা বের করে ধরল আমার দিকে, বাবুজী আপনার অপিনিয়নটা লিখে দিন।

দেখলাম ভিজিটরস অপিনিয়নে খাতাটি ভরা। ইংরেজীতে ছোট করে লিখে দিলাম: MD. S. the present guide of Nizamuddin Aulia's Dargah is a nice man. His profound knowledge has charmed me. I believe that his guidance helps the visitors a lot.

নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দর্গা থেকে বেরিয়ে আসতেই গাড়ি চলল হুমায়ুনের কবরের দিকে। শুনেছিলাম, দিল্লী ঠগের জায়গা। ট্যাক্সি, রিকসা, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি নবাগত যাত্রী পেলেই ঠকায়। আমার অটোরিক্সার ড্রাইভারটাকে দেখলাম সৎ রিক্সাচালক। দিল্লীর দর্শনীয় স্থানের কোনটাই সে বাদ রাখছে না আমাকে দেখাতে। ইচ্ছে করলে দু একটা ফাঁকীও দিতে পারত। কিন্তু সেরকম ভাবসাব তার নেই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে নিয়ে সে হুমায়ুনের কবরের কাছে এল। হুমায়ুনের কবরের গেট পেরতেই সবুজ ঘাসের লন। চোখ জুড়ানো সবুজ ঘাস। স্নিগ্ধ প্রশান্ত। হুমায়ুনের সমগ্র জীবনটা ছিল যন্ত্রনার দাহে পূর্ণ। এই সবুজ ঘাসের প্রশান্তি কবরের নিচে তিনি পেয়েছেন কিনা কে জানে!

লন পার হয়ে সমাধি। ছবিতে তাজমহলের ছবি দেখেছি। কিছুটা যেন সেই কলাকৌশলে তৈরি। হুমায়ুনের সমাধি তাজমহলের অনেক আগেই তৈরি হয়েছিল। অনেকের মতে তাজের পূর্বসূরী হল এই সমাধি। লনে সবুজ ঘাস থাকলেও সমাধির গায় একটি ধূসর বৈরাগ্যের ছাপ। হুমায়ুন নাকি নিজে এই সমাধির স্থান নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী হাজি বেগম এটা আরম্ভ করেন। শেষ করেন আকবর। তখনকার দিনে এটা নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছিল পনের লক্ষ টাকা। আকবর নিজে শিল্পী ছিলেন, তাই এই সৌধে একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

হুমায়ুনের দ্বিতল সমাধির উপরিভাগ এক আশ্চর্য কৌশলে তৈরি। যেন একটা গোলক ধাঁধা। উপরে উঠে নিচে নামতে গিয়ে আক

পথ পাই না। সত্যিই ভয় ঢুকে যায়। যেখানেই নামতে যাই, গিয়ে দেখি পথ বন্ধ। এত পথ আছে অথচ পথের সন্ধান মিলেনা। প্রথমটা আমি বেশ হকচকিয়ে গেলাম। হঠাৎ মনের মধ্যে অদ্ভুত এক চিন্তা ঢেউ গেলে গেল। সংসারের এ এক নিখুঁত চিত্র। সংসার আবর্তে প্রবেশ করলে এমনিই লোকে দিশেহারা হয়ে যায়। মুক্তির পথ গোলকধাঁধার মত বিভ্রান্ত করে। সহজে বেরুতে দেয়না। জানিনা হুমায়ুনের আত্মা এই ধরনের এক গোলক ধাঁধায় আজো ঘুরছে কিনা।

আমি পথ খুঁজে খুঁজে সত্যিই হন্নে হয়ে গেলাম। হতাশ হয়ে পড়ছি, দেখি দুটো বাচ্চা ছেলে নিচে নেমে যাচ্ছে। তাদের পথ ধরেই নিচে নামার পথ পেয়ে গেলাম। আশ্চর্য! বোধহয় শিশুর মত মন না হলে এমনি ভাবে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়না।

হুমায়ুনের কবর থেকে বেরুতেই গাড়ি আমাকে নিয়ে গেল খুব পুরানো একটি জায়গাতে। এ আবার কোন্ প্রাচীন রাজা বা মধ্যযুগীয় সুলতানের কে জানে! ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, ইন্দ্রপ্রস্থ।

ইন্দ্রপ্রস্থ! মানে সেই মহাকাব্যের, মহাভারতের যুগ! আমাদের রক্তে রক্তে বিন্দুতে বিন্দুতে যে মহাভারতের গন্ধ জড়ানো রয়েছে! এই 'ঈন্দ্রপ্রস্থ' রাজ্য ভাগ হবার পরে পাণ্ডবদের রাজধানী হয়! এই রাজধানীতে রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত দুর্যোধন ময়দানবের তৈরি প্রাসাদে অপমানিত হয়েছিলেন তার স্ফটিকের কাজ বুঝতে পারেননি বলে। এই অপমান হিংসার আগুনে জ্বলে উঠে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাণী প্রচারিত হয়েছিল—গীতাসার। ইতিহাসের বিচারে গীতাসার যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত বাণী নয়। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে যে একটা অধ্যাত্মদর্শন গড়ে উঠেছিল তারই সংকলন মাত্র। স্বয়ং বিবেকানন্দ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে গীতাসার প্রচারের গল্পে আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু প্রশ্নটা হল গীতাসারের যে সত্যতা তাই। নিরাসক্ত

কর্মের যে মহান আদর্শ গীতাসার দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন অধ্যাত্ম দর্শনে তার তুলনা নেই। রিক্সা থেকে প্রায় লাফিয়েই নেমে পড়লাম।

অতি প্রাচীন কালের একটি ধূসর গন্ধ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক নিদর্শন বলতে প্রায় কিছুই নেই। আছে শুধু দুর্গের দেয়াল। প্লেটে লেখা পরিচয়। কিন্তু এই দেওয়ালও রাজগৃহে বিম্বিসারের দেওয়ালের মত নয়, যা থেকে বলা যেতে পারে যে, এ হল সেই মহাভারতের যুগের। হিন্দু ধর্মার্থীদের বিশ্বাস খ্রীষ্টের জন্মের তিনহাজার বছর আগে তৈরি হয়েছিল এই দেয়াল। ঐতিহাসিকেরা ঋগ্বেদের রচনাকালকেই খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার থেকে এক হাজার বছরের আগে ফেলতে চান না। মহাকাব্যের যুগ ঋগ্বেদের অনেক পরের। খ্রীষ্টপূর্ব আটশ থেকে পাঁচশ অব্দের মধ্যে হতে পারে। এ সময়ের প্রাচীন নিদর্শন ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট দ্বীপে ও গ্রীসে বেঁচে আছে, ভারতে নেই। কোথাও সেই যজ্ঞশালার চিহ্ন, প্রাসাদের চিহ্ন পাওয়া গেলনা। গম্ভীর এক মৌন শুধু অনুভবের মধ্যে বলতে লাগল, মনকে সেখানে পাঠিয়ে দাও।

সেই মহাভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যের কোন নিদর্শন নেই বটে, তবে মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শন আছে। আছে একটি দুর্গের কিছু সাক্ষ্য। এই দুর্গ আরম্ভ করেছিলেন হুমায়ুন। শেষ করেন শেরশাহ। দুর্গের অভ্যন্তরে শেরের একটি মসজিদ ছাড়া আর কিছু নেই। এখনও এখানে ওখানে কিছু ঢিবির দেখা পাওয়া যায়। ব্যাখ্যাতীত কোন রহস্যকে যেন বুকে চেঁপে ধরে রেখেছে। বিচার বুদ্ধিতে সেই আবরণ উন্মোচন করা আজ প্রায় অসম্ভব। ত্রিকালদর্শী কবির মনই হয়তো কেবলমাত্র হদিশ পেতে পারে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে সেই অতীত জীবনের স্মৃতি স্মরণের মধ্যে টেনে আনতে চাইলাম। কিন্তু সময় বেশি অনুমোদিত নয়। একবেলার মধ্যে দিল্লীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে মথুরার দিকে রওনা হতে হবে। মথুরার তীর্থই আমার মূল লক্ষ্য, যাবার পথে দিল্লীর এই ইতিহাস। তীর্থে চিরন্তন অধ্যাত্মসত্য,

ইতিহাসে অনিত্যতার ব্যর্থতা। তবু তার মূল্য আছে, কারণ অনিত্যতার ব্যর্থতাই নিত্যের দিকে মানুষকে টানতে পারে। সেই কারণে তীর্থপথে ঐতিহাসিক স্থান দর্শন অপ্রাসঙ্গিক নয়।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে নেমে আবার অটোরিক্সা চাপলাম। পাশ দিয়ে চলে গেল ফিরোজ কোটলা, ফিরুজ তুঘলকের রাজধানী। ফিরুজ তুঘলক অনিত্য ইতিহাসে একজন ব্যর্থ অভিনেতার ভূমিকা পালন করে গেছেন। কিন্তু একটি নিত্যবস্তুকে তিনি তাঁর কোটলাতে স্থান দিয়েছিলেন—অশোক স্তম্ভ। তিনি এই স্তম্ভটি বাইরে থেকে তুলে এনে কোটলাতে বসিয়েছিলেন। ইতিহাসের দিগ্বিজয় ক্ষণস্থায়ী কিন্তু অশোক যে ধর্মবিজয় করেছিলেন মানুষের ইতিহাসে তাঁর স্থান চিরকালীন। অশোকস্তম্ভ সেই ধর্মবিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে ফিরোজ কোটলার অনিত্য ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়ে দেদীপ্যমান ভঙ্গীতে আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। আত্মশক্তি ও নৈতিকশক্তি স্থূল-শক্তিকে চিরদিনই পরাজিত করে বেঁচে থাকে। চেঙ্গিস খাঁ থেকে আলাউদ্দীন ইতিহাসের পাতায় কয়েকটি চরিত্র মাত্র। কিন্তু কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য মানুষের হৃদয়ে চিরন্তন আসন পেতে বসে আছেন।

দেখতে দেখতে রিক্সা ফিরোজ কোটলা পার হয়ে গেল। ছাড়িয়ে গেল বিজয় চৌক, কালান মসজিদ। তারপর এসে থামল বিরাট এক ইমারতের কাছে। নাম শুনতেই যেন অন্তরের অভ্যন্তর থেকে ইতিহাস ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—জামা বা জুমা মসজিদ। চোখের সামনে দেদীপ্যমান গম্বুজগুলো জ্বলে উঠল। ইতিহাসের প্রথম পাঠ যে নিয়েছে সেও এই মসজিদের কথা জানে। এটা পৃথিবীর অন্যতম সর্ববৃহৎ মসজিদ। দিল্লীতে যখন শাজাহান তাঁর নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন তখন এই মসজিদটি নির্মিত হয়। প্রত্যেকদিন পাঁচ হাজার মিস্ত্রী অনবরত কাজ করে পাঁচ বছরে এই মসজিদটি নির্মাণ শেষ করে। লাল বেলেপাথর আর শ্বেত পাথর দিয়ে নির্মিত। রিক্সা থেকে নামলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম। দৈর্ঘ্যে প্রায় দুশ ফিট হবে।

প্রস্থে একশ কুড়ি ফুটের মতন। গগনচুম্বী বিরাট গম্বুজ। দেখলে বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয়। পাশে দুটি বিরাট মিনার। মসজিদে প্রবেশ করার জন্য তিনটি পথ। প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটি জলাশয়। নামাজ পড়বার আগে হাত মুখ ধুয়ে পুণ্যার্থীরা ওজু করে। বিরাট প্রাঙ্গণ। হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে বসে নামাজ পড়তে পারে। রাজকীয় প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা চমক লাগে। অগুন্তি কবুতর নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছে।

সম্রাট শাজাহান স্থাপত্যশিল্পে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। কোথাও ছোটখাটো কিছু নির্মাণ করতে চাননি। বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের শক্তির সঙ্গে তাল রেখে নিজের অহংকারের প্রকাশ হিসেবে সব সময়ই গুরুগম্ভীর স্থাপত্যকীর্তি তৈরী করতে তিনি ভাল বাসতেন। ব্যতিক্রম শুধু আগ্রাদুর্গের মতি মসজিদ। ব্যাপক বিশালতার পরিবর্তে জঁাকজমকের বিশালতা তিনি সেখানে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। জানিনা, শাজাহান ধর্মস্থানের এই গাম্ভীর্যের কথা জানতেন কিনা। জানিনা, তিনি জানতেন কিনা যে, গগনচুম্বী মসজিদের এই গম্বুজ অনন্তের প্রতি ইঙ্গিত জানাচ্ছে। জানিনা আজানের যে ধ্বনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে অনন্তের সঙ্গে মিশে যায় সেই ধ্বনির শেষ রেশটুকু তিনি অনুধাবন করতে পারতেন কিনা। হিন্দুদের অ-উ-ম, খ্রীষ্টানদের গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি ঢং—, আর মুসলমানদের আল্লা-আ-আ-আ ধ্বনি সবই অনন্তের দিকে ইঙ্গিত দেয়। এই মসজিদে সম্রাট শাজাহানের অহংকার আমার নজরে পড়লনা, পড়ল সেই গম্ভীর বিশাল অনন্তপ্রসারী ইঙ্গিত। অনিত্যের দুয়ার ছেড়ে অনন্তের দিকে এই ইঙ্গিতের যাত্রা। ক'জন তা ধরতে পারে কে জানে!

জুমা মসজিদ দেখা শেষ করে ফিরে এসে অটোরিক্সায় চাপতেই ড্রাইভার বলল, আর একটি সমাধি আছে, দেখবেন?

বললুম, কার?

সে বলল, সফদর জঙ্গের।

সফদর জঙ্গের ইতিহাস অনেকেই জানেন না। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি জানি। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দিনে এক বিয়োগান্ত নাটকের তিনি নায়ক। তাঁকে কেন্দ্র করে অনেক নটনটীর কান্না আজও মোগল ইতিহাসকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে। ইতিহাসের জাঁকজমক আমাকে টানে না বটে, কিন্তু করুণ কান্নার সুরে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়। চোখের জল তা অধ্যাত্ম কারণেই হোক আর পার্থিব কারণেই হোক বড় মধুর। যে পবিত্র উৎস থেকে তার জন্ম স্বয়ং ভাগীরথীও বোধহয় সে পবিত্রতা দাবি করতে পারেন না। সুতরাং বললাম, যাবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অটোরিক্সা এসে সফদর জঙ্গের সমাধির পাশে থামল। রাজা বাদশা ওয়াজীরেরা অধ্যাত্ম জীবনের সাধনা করেননি বটে, তবে তাঁদের সমাধিমন্দিরের গায় সর্বত্রই একটা ধূসর বৈরাগ্য জড়ানো আছে। সফদর জঙ্গের সমাধিও সেই ধূসর বৈরাগ্য থেকে মুক্ত নয়। সেই সমাধির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সফদর জঙ্গের বিয়োগান্ত জীবনের কথা মনে পড়তে লাগল।

সফদর জঙ্গ ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের পড়ন্ত বেলায় ইরানী দলের নেতা। আপন চেষ্টায় তিনি অযোধ্যার সিপাহশালার হয়েছিলেন। আপন যোগ্যতাতেই তিনি বাদশা মহম্মদ শাহের ওয়াজীর পদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তুরানী নেতা ইমাদ-উল-মুলকের হাতে তাঁর ওয়াজীরত্ব গেল। অথচ এই তুরানী তরুণ নেতাকে তিনি নিজের পুত্রের মত মানুষ করেছিলেন। ওয়াজীরত্ব যাবার মূলে রয়েছে একটি প্রণয়-কাহিনী। প্রণয় কাহিনীটি অত্যন্ত করুণ ও অশ্রুসিক্ত। সেই প্রণয় কাহিনীর নায়িকার নাম কবি আলিকুলি খাঁর কন্যা গন্নাবেগম।

ভারতবর্ষের বাদশা তখন মহম্মদ শা। নর্তকী আর সিরাজীতে তিনি আসক্ত। বাজারের এক নর্তকীকে সাদি করে প্রধানা বেগম করেছেন। নাম উধম বাঈ। দরবারে নিত্য বিরোধ চলেছে ইরানী আর তুরানী আমীরদের। পারশ্যে তখন এক দুর্ধর্ষ মেষপালক রাজ-

সিংহাসন অধিকার করে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর নাম নাদির শা। তাঁর ভয়ে ইরাণের বহু অভিজাত ব্যক্তি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন হলেন কবি আলিকুলি খাঁ। প্রণয়িনী খাদিজা সুলতানকে নাদির শা ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন নিজের হারেম। বেদনার্ত কবি এসে আশ্রয় নিলেন ভারতবর্ষে মহম্মদ শার দরবারে। বাদশা মহম্মদ শা তাঁকে সভাকবি করে নিলেন।

পরিবর্তনশীল মানুষ, তার দেহে, প্রাণে, মনে। সেই জন্যই মানুষ সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে অনিত্যের খেলা খেলে। মানুষের যদি পরিবর্তন না হত, তাঁর স্মৃতি যদি এক ধ্রুব লক্ষ্যে চিরকাল স্থির থাকত, তাহলে সংসার সংসার থাকত না, অচল হয়ে পড়ত। পৃথিবী স্বর্গের মত হত। একই দেবতা, একই দেবী, একই ভালবাসা, একই ক্ষমতা, মানুষ দেবতা হত। কিন্তু মানুষ দেবতা নয়, মানুষ। সেইজন্য চিরকাল সে স্থির থাকে না। চিরকাল এক বিশ্বাস ধরে রাখে না। ঘাতে প্রতিঘাতে নিত্য তার অগ্রগতি। অতীত ছাড়িয়ে বর্তমানে তার প্রবেশ। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে তার ইঙ্গিত। অতীতকে আকড়ে ধরলে মানুষ বর্তমানে আসতে পারত না। বর্তমানকে চিরন্তন বলে মেনে নিলে মানব সভ্যতায় অগ্রগতি হত না। পৃথিবীর এই চিরন্তন প্রবাহের বাইরে আলিকুলিও ছিলেন না। তাই একদিন তাঁর অন্তর থেকে প্রণয়িনীকে হারাবার বেদনা ধীরে ধীরে চেতন মন থেকে অবচেতন এবং অবচেতন মন থেকে অচেতন মনের স্তরে ডুবে গেল। সেখানে নতুন করে ভাল লাগল আর একজনকে। বাদশার দরবারের এক নর্তকীকে। তাকেই সাদি করলেন তিনি। সেই নর্তকীও ছিল শিল্পরুচির অধীশ্বরী। তাঁদের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল একটি। একটিমাত্র কন্যা। নাম গন্না বেগম। মা বাবা তাকে মানুষ করলেন মনের মত করে। মেয়ে শিখল নাচগান। হল কবিত্বশক্তির অধিকারিণী। অপূর্ব সুন্দরী কন্যা। নাম ছড়িয়ে পড়ল দিল্লীর অভিজাত মহলে। বাদশার পুত্রেরা পর্যন্ত তাঁর পাণি প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু এই অপরূপ সুন্দরী ও অনবদ্য গুণান্বিতা মেয়ের জন্য বাদশা-পুত্রদেরও গ্রহণ করতে রাজি নন আলিকুলি দম্পতি। তাঁরা স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, আরও বিরাট ব্যক্তির গিন্নী হবে গন্না। সে হবে সুখী। কিন্তু বিধাতার পরিহাস কে বোঝে।

দিল্লীতে তখন চলেছে অন্তর্কলহ। আলিকুলিকে স্নেহ করতেন নতুন ওয়াজীর সফদর জঙ্গ। বাদশা মহম্মদ শাহের তখন মৃত্যু হয়েছে। নতুন বাদশা হয়েছেন আহম্মদ শা! সফদর জঙ্গের ঘরে যাতায়াত করতেন গন্না বেগম। সেখানেই একদিন ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। সফদর জঙ্গের পয়লা নম্বরের শত্রু দাক্ষিণাত্যের নিজাম উলমুলকের মৃত্যু হল। পারিবারিক কলহে বিব্রত হয়ে নিজামের সতের বছর বয়স্ক পুত্র ইমাদ-উল-মুলক এসে আশ্রয় প্রার্থনা করল পিতৃশত্রু ঐ সফদর জঙ্গেরই কাছে। সফদর জঙ্গ লোক হিসেবে ছিলেন সরল প্রকৃতির। নির্দ্বিধায় ইমাদকে তিনি আশ্রয় দিলেন। বাদশার দরবারে তাকে একটা উল্লেখযোগ্য পদও দিলেন। কিন্তু সেই ইমাদই করল শত্রুতা। সফদর জঙ্গের গৃহেই একদিন ইমাদ দেখল গন্নাকে। দেখেই মুগ্ধ হল। কিন্তু সে জানতে পারল যে, সফদর জঙ্গ তাঁর নিজের পুত্র সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সাদি দিতে চান গন্নার। কিন্তু ইমাদ পণ করে বসল, গন্নাকে তার চাইই। তখন থেকেই সে হল সফদর জঙ্গের পয়লা নম্বরের শত্রু। দরবারে ষড়যন্ত্র করে সেইই একদিন সফদর জঙ্গকে হটিয়ে দিল ক্ষমতা থেকে। সফদর জঙ্গ ফণা তুলে ধরলেন বাদশা আহম্মদ শার বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে বাদশা বাহিনীর নেতৃত্ব করলেন ইমাদ। ইমাদের পরামর্শে বাদশা ইরানীদলের লোকদের রাজপদ থেকে বরখাস্ত করলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আলিকুলির পদমর্যাদা আরও বেড়ে গেল। ইমাদ চাইলেন আলিকুলিকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কন্যার পাণি গ্রহণ করতে। কিন্তু আলিকুলি তখন সফদর জঙ্গের শিবিরে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সফদর জঙ্গ গেলেন অযোধ্যাতে নিজের সুবাতে। সঙ্গে গেলেন আলিকুলি ও তাঁর পরিবার। যে জন্য ইমাদের এত চেষ্টা সেই গন্নাকেই

সে পেলনা। ইমাদ এজন্য দায়ী করল বাদশা আহম্মদ শাহকে। ফলে বাদশা নিজেই গদিচ্যুত হলেন। নতুন বাদশা বসলেন সিংহাসনে,—দ্বিতীয় আলমগীর।

অযোধ্যায় ফিরে বেশিদিন বাঁচলেন না সফদর জঙ্গ। কিন্তু তাঁর মৃত্যুশয্যায় আলিকুলি প্রতিজ্ঞা করলেন, গন্নাকে সুজার হাতে তুলে দেবেন। সফদর জঙ্গের শেষ ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। কিন্তু সাদি হবার আগেই সফদর জঙ্গ মারা গেলেন। ইমাদের সঙ্গে মিটমাটের জন্য আলিকুলিকে পাঠানো হল দিল্লীতে। সপরিবারে আলিকুলি এলেন দিল্লী। ইমাদ যথেষ্ট সম্মান করলেন আলিকুলিকে। সাদির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু কন্যা তখন বাগদত্তা সুজার কাছে। আলিকুলি রাজী হতে পারলেন না। এদিকে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দমন করতে গেলেন ইমাদ। পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্রী মুঘলানী বেগম। তার কন্যা উমদা বেগম। ইমাদের সে বাগদত্তা। গন্নাকে সাদি করতে গেলে পাছে মুঘলানী বেগম ক্রুদ্ধ হন—এই জন্য দিল্লীতে ফেরার সময় তাকে বন্দী করে নিয়ে এলেন ইমাদ।

ইতিমধ্যে ইমাদের অনুপস্থিতিতে দিল্লীতে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল সুজাকে ওয়াজির করার জন্য। সেই ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছিলেন আলিকুলিও। এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন ফরাক্কাবাদের নবাব আহম্মদ বঙ্গাস। ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে দ্রুত দিল্লীর দিকে ছুটলেন ইমাদ। এমন সময় বিপর্যয়। হঠাৎ মারা গেলেন আলিকুলি। তাঁর বিধবা পত্নী গন্নাকে নিয়ে পড়লেন মহাবিপদে। ইমাদ দিল্লীতে ফিরলে কী শাস্তি দেবে কে জানে! রাত্রির অন্ধকারে গন্নাকে নিয়ে দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন তাঁর আম্মাজান। গন্নাবেগমের গুণ ও সৌন্দর্যের কথা তখন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। আগ্রার কাছে জাটদস্যু জওয়াহির সিং তাকে বন্দী করার চেষ্টা করল। কোনরকমে পালিয়ে গিয়ে গন্না ও তার আম্মাজান আশ্রয় নিলেন ফরাক্কাবাদের নবাব আহম্মদ বঙ্গাসের কাছে। অযোধ্যাতে ফিরে যাবার জন্য বঙ্গাসের পরামর্শ চাইলেন।

বঙ্গাস তখন ঘুরে গেছেন। সুজাকে ছেড়ে তিনি ঝুঁকে পড়েছেন ইমাদের দিকে। গন্নার আম্মাজানকে তিনি বোঝালেন, সুজার চাইতে ইমাদ পাত্র ভাল, সেখানেই গন্নার সাদি দাও। ইমাদ মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে গন্নাকে। গন্নার আম্মাজান রাজি হলেন। তিনি মনে মনে সুজাকে পছন্দ করতেন না, কারণ সুজা ছিল লম্পট ও চরিত্রহীন। সুতরাং বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই খুশী। ইমাদের প্রণয়ের স্বপ্ন সফল। কিন্তু ভাগ্য তখন হাসছিল।

গন্নার সঙ্গে যে রাতে ইমাদের সাদি হয় সে রাতে মুঘলানী বেগম পালিয়ে যান পাঞ্জাবে। ইমাদের উপর তিনি ভয়ানক ক্ষিপ্ত। তখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছেন আহম্মদ শা আবদালি। মুঘলানীকে তিনি বেটি বলে ডাকতেন। স্নেহ করতেন। ইমাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা মুঘলানী বেগম নালিশ করলেন আহম্মদ শা আবদালীর কাছে। আহম্মদ শা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এর প্রতিকার তিনি করবেনই। তিনি জানতে চাইলেন মুঘলানী বেগম কি চান? মুঘলানী বেগম জানালেন, ইমাদ তার বাগদত্তা কন্যা উমদাবানুকে সাদি করুক, তিনি এই চান। আহম্মদ শা প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দিল্লীতে তখন কাপুরুষের রাজত্ব। আহম্মদ শা ভারত আক্রমণ করতে এসেছেন শুনে অনেকেই তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেছেন। যোগ দিয়েছেন আবদালীর দলে। আবদালী এগিয়ে এলেন দিল্লীর দিকে। খবর পেয়ে ইমাদ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন আহম্মদ শাকে। কিন্তু প্রয়োজন-কালে দেখা গেল কেউ নেই। সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ত্যাগ করেছে।

দিল্লীর কাছে বাদলিতে এসে তখন শিবির ফেলেছেন আহম্মদ শা। ইমাদকে হুকুম করলেন সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অসহায় ইমাদ বাধ্য হয়ে এলেন দেখা করতে। আহম্মদ শা তাকে ভর্ৎসনা করলেন—বাগদত্তা উমদাবানুকে ছেড়ে নর্তকীর মেয়েকে সে সাদি

করেছে বলে। হুকুম দিলেন, গন্নাকে তালাক দিতে হবে। সাদি করতে হবে মুঘলানী বেগমের কন্যা উমদাবানুকে। অসহায় ইমাদের কিছুই করার থাকল না। উমদার কাছে এক কড়ির বিনিময়ে গন্নাকে তিনি বিক্রী করে দিতে বাধ্য হলেন। উমদা হল তার নতুন বেগম। গন্না ক্রীতদাসী। পিতা যে কন্যাকে তুনিয়ার সব চাইতে সুখী গৃহিণী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তার হল এই পরিণাম। সর্বগুণসম্পন্না বিদুষী গন্না নিজেও কি একথা কল্পনা করতে পেরেছিল? অনবদ্য রূপ-যৌবন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণরাজী নিয়ে গন্নাকে হতে হল উমদাবানুর বাঁদী। এইভাবেই প্রায় আঠার বছর থাকতে হয়েছিল তাকে। তারপর মুক্তি পেয়েছিল। যখন মুক্তি পেয়েছিল তখন বিগতযৌবনা। গোয়ালিয়রের তের মাইল উত্তরে নূরাবাদে তার কবর আছে। পৃথিবীর কাছে আর কিছুই চায়নি গন্না। শুধু শেষ প্রার্থনা রেখে গিয়েছিল এইটুকু যে, তাঁর মৃত্যুর পর তার কবরের উপর যেন তার নিজেরই লেখা তুটো পয়ার উৎকীর্ণ করে দেওয়া হয় 'ওহ্! ঘম-ই গন্না বেগম'। হায়, গন্নাবেগমের জন্য একটুখানি কাঁদ। গন্নার কবরের উপর সেই অশ্রু আজও টলমল করছে।

(মানব জীবনই মানুষের কাছে সব চাইতে বড় শাস্ত্র। কেউ যদি মানব জীবনের প্রতিটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, আমরা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চলতে পারি না। আমরা চিন্তা করি এক, ঘটে আর এক। ভাগ্যবাদীরা একে বলেন নিয়তির খেলা। অন্তরবাদীরা বলেন অন্তরের খেলা। ভাগ্যবাদীরা মনে করেন বাইরে কোন ঈশ্বর আছেন তিনিই সব নিয়ন্ত্রণ করেন। আমাদের ইচ্ছাই ইচ্ছা নয়, তাঁর ইচ্ছাই ইচ্ছা। আমরা তাঁর ইচ্ছার স্বরূপ বুঝি না বলেই মার খাই। অন্তরবাদীরা বলেন, এ ইচ্ছা আমাদের অন্তরতমেরই ইচ্ছা, নিজেদেরই ইচ্ছা, আমরা বুঝিনা তাই। মনের গভীর গহনে কান পাতবার ক্ষমতা আমাদের ক'জনের আছে? আমরা আমাদের বাইরের ইচ্ছাতেই চলি, ভেতরের ইচ্ছার ইঙ্গিত বুঝিনা,

সেইজন্যই জীবনে আমাদের এই ট্র্যাজেডি। কিন্তু সেই ভেতরের মনের ইচ্ছাকে জানা যাবে কি ভাবে? মনস্তত্ত্ববিদেরা অপরের মনের অবচেতনে তাকাতে পারেন। কিন্তু নিজের মনের গহনে তাকাবার পথ বাতলে দিতে পারেন না। এ পথ বাতলাবার অধিকার আছে শুধুমাত্র অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী ব্যক্তিদের। তাঁদের খুঁজতেই তো বেরিয়েছি। তাঁদের খোঁজার পথেই এই পার্থিব ভূমিতে অবতরণ। জানি এখানে সাধু সন্ন্যাসী থাকেন না। কিন্তু তবু কোথায় কি যে পাওয়া যেতে পারে কে বলবে! এই পার্থিব লীলাভূমিতেই তো লালবাবার মত যোগীপুরুষ শাজাদা দ্বারা শুকোকে অধ্যাত্মজগতের শিক্ষা দিয়েছিলেন? আমার চোখে কোন সাধুসন্ত পড়েনি, কিন্তু অনিত্য এই জীবনে সেইসব অধ্যাত্ম পুরুষদের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা বার বার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সফদর জঙ্গের সমাধি দেখাবার পর অটোরিক্সাওয়ালা আমাকে নিয়ে চলল লালকেল্লার দিকে। সূর্য তখন মাথার উপর অনেকটা উঠে গেছে। লালকেল্লা দেখতেই অনেকটা সময় কেটে যাবে। তারপর অপরাহ্নে লালকেল্লার দুর্গের ছায়া থেকে মথুরাগামী দূরপাল্লার বাসে চাপতে হবে। একদিনে পুরানো দিল্লীর সবকিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখবার চেষ্টা করা দুস্পর্ধা মাত্র। সুতরাং অটোরিক্সাওয়ালাকে অন্য কোথাও যেতে বললাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি এল বিরাট দুর্গের কাছে। লাল পাথরের দেয়াল। ভেতরে প্রাসাদ। একদিকে সামরিক ছাউনী। মধ্যযুগের সমস্ত দুর্গেই এমন ব্যবস্থা থাকত। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান রাজাদের বিশেষ করে মোগলদের প্রাসাদই ছিল শিবির। আর শিবিরই প্রাসাদ।

এই লালকেল্লা তৈরী করেন বাদশা শাজাহান। আগ্রায় বছর দশেক থাকার পর অতিরিক্ত গরমে শাজাহান সেখানে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের কথা চিন্তা করেন। আগ্রা দুর্গের মধ্যে স্থানের অভাব ছিল। আগ্রা শহরে জমি

ছল অসমান। এইজন্য তিনি দিল্লীতে নতুন শহর শাজাহানাবাদ তৈরী করেন। সঙ্গে এই দুর্গ। দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ হয় ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। শেষ হয় ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুর্গের পরিধি দেড় মাইল। দুর্গ অষ্টভুজাকৃতি। দৈর্ঘ্যে তিন হাজার ফিট। প্রস্থে আঠারশ ফিট। নদীর দিকে যে প্রাচীর তার উচ্চতা ৬০ ফিট। স্থলভাগের দিকে এর উচ্চতা একশ দশ ফিট। সমতলভূমি থেকে উচ্চতা পঁচাত্তর ফিট। চারদিকের পরিখা প্রস্থে প্রায় পঁচাত্তর ফিট এবং গভীরতায় ত্রিশ ফিট।

আমার অটোরিক্সা গিয়ে থামল লাহোর দরজার কাছে। এখান থেকে দর্শনী মূল্য দিয়ে টিকিট কেটে দুর্গে ঢুকতে হয়। দুর্গে ঢুকতেই একজন গাইড পাকড়াও করল। কিন্তু গাইডের প্রয়োজন নেই। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে দিল্লী দুর্গের স্থাপত্য কলাকৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে নিয়েছি। সুতরাং গাইড ছাড়াই আমি এগুলাম।

নহবতখানার ভিতর দিয়ে এলাম দেওয়ানী আমে। এই দেওয়ানী-আম অপূর্ব কারুকার্যখচিত। দেখলে দৃষ্টি ফেরানো যায়না। দেওয়ানী-আম হল সভাকক্ষ। সেখানে মোগল সম্রাটেরা দরবার বসাতেন। বিরাট সভাকক্ষ, প্রায় ৫৫০ ফিট দীর্ঘ ও ৩০০ ফিট প্রস্থ। মূল হলঘর হল ৮০ ফিট দীর্ঘ, ৪০ ফিট প্রস্থ ও ৩০ ফিট উঁচু। লাল বেলে পাথরের থামে সোনার কাজ করা ছিল। এখন সোনা নেই, সোনার জলের রেখা আছে। এই সোনার জলের রেখার ব্যবস্থা করেছিলেন পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন। ভারতবাসীর প্রতি তাঁর ঘৃণা থাকলেও ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। থামগুলো শঙ্খের গুড়ো দিয়ে চিত্রিত বিচিত্রিত। পেছনে দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় যে মর্মর প্রস্তর, একে বলে 'বালদা চিনো'। একে 'নসমন জিল ইলাহি' বা 'ঈশ্বরের দয়ায় বসবার আসন' নামেও উল্লেখ করা হত। জনসাধারণ একে বলতো ঝরোকা। সম্রাট প্রত্যেক দিন এখানে বসে দরবার করতেন। সাত ফুট দৈর্ঘ্যে ও তিন ফুট প্রস্থে এটি একটি মর্মর মঞ্চ। এর সামনে ছিল ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৩০ ফুট প্রস্থ

রৌপ্য নির্মিত একটি আসন। গণ্যমান্য আমীরেরা এখানে বসতেন। বাকী অংশে বসতেন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। 'গুলালবারি' বা বাইরে বসতো নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা। মঞ্চের সামনে বাদশার দর্শনার্থী প্রজারা এসে দাঁড়াতো। দেওয়ানী আমের প্রাচীর গাত্রের কাজ করেছিলেন একজন বাইরের শিল্পী 'পিয়েত্রা তুয়া'। কেউ কেউ বলেন, আসল কাজ করেছিলেন শাজাহানের প্রিয়পাত্র 'অষ্টিন দ্য বোরডকস' নামে একজন পলাতক ইউরোপীয়ান। কারুকার্যের ফুল ফল ও পাখিগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। লালকেল্লার উপর লুণ্ঠকের অত্যাচার কম হয়নি। লুটেরারা দুর্গে ঢুকে মণিমানিক্য মুক্তা যা পেয়েছে লুটে নিয়েছে। দেয়াল থেকেও খুঁটে খুঁটে রত্নগুলি তুলে নিয়েছে। কিন্তু এই বলাৎকারের পরেও এখনও অবশিষ্ট যতটুকু সৌন্দর্য টিকে আছে, তারও তুলনা নেই। কিন্তু সম্রাট শাজাহানের রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বার সৌভাগ্য হয়নি ঃ

একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর সাজাহান
কাল স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।

স্থাপত্যসুন্দরীর দেহে আজ বার্ধক্যের ছাপ। একদিন জরাজীর্ণ হবে। তারপর কালের নিয়মে ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। সামনে এই মহাসত্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা মানতে চায়না। সে অমরত্ব কামনা করে, নামযশ খ্যাতির অমর স্মৃতিসৌধ তুলতে চায়। অথচ সে বুঝেও বুঝতে চায়না যে, এসব কিছুই থাকবেনা। ইতিহাস চিরন্তন নয়। গ্রহ নক্ষত্র মহাবিশ্বও চিরন্তন নয়। বাইরে যা দেখা যায় তার কিছুই চিরন্তন নয়। চিরন্তন রয়েছে মানুষের নিজেরই অন্তরের অভ্যন্তরে।

দেওয়ানী আম যেমন দরবার, দেওয়ানী খাস হল ক্ষুদ্র দরবার। এখানে মোগল বাদশারা তাঁদের মুষ্টিমেয় পারিষদদের নিয়ে পরামর্শ করতেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখানেই নেওয়া হত। দেওয়ানী খাস, মোগল স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। শ্বেতপাথরের একখণ্ড